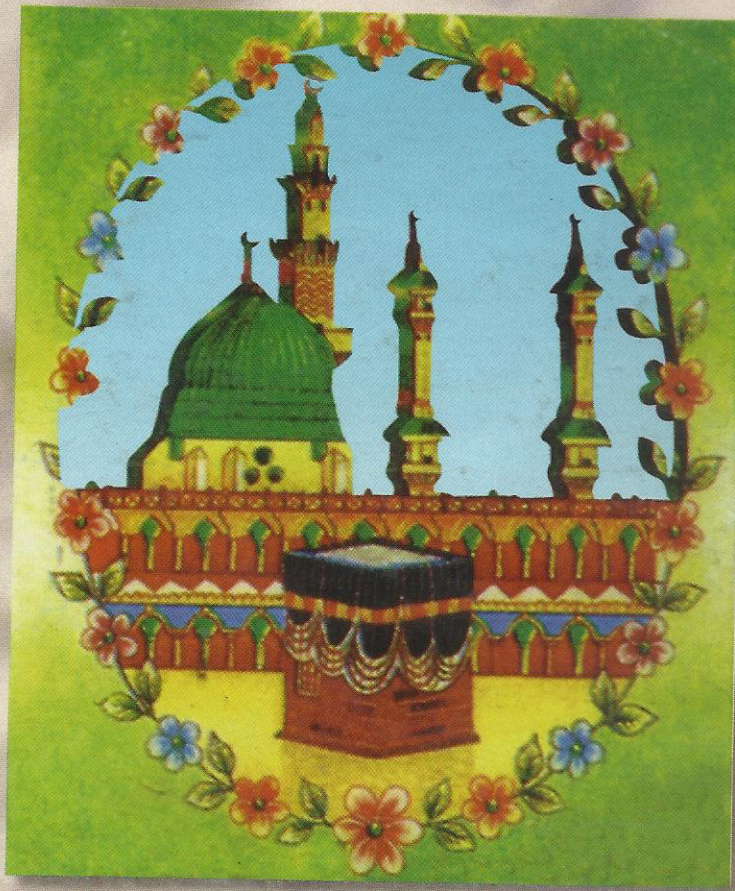


প্রশ্নোত্তরে
আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা

মূল : আল্লামা শেখ জাঈন ইবনে ছামীত আলভী হোসাইনী



অনুবাদ : অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল
কামিল, এম এ, বিসিএস

જોડાવ

જોડાવ, સાચાં, વિદ્યુત-અવગત

અવગત- અવગતની જોડાવ (જોડાવ)-કે.

જોડાવ

09/2/2021

উৎসর্গ

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে আমার প্রথম পথ প্রদর্শক ওস্তাদ হাফেজ ফজর আলী সাহেব দ্বিতীয় ও অন্যতম পথপ্রদর্শক ওস্তাদ ও শূণ্ডর মরহুম হাফেজ মাওলানা সেরাজুল ইসলাম সাহেব, আমার পীর ও মুর্শেদ গাউসে জামান হযরত হাফেজ কারী শাহসূফী আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (পাকিস্তান), তরিকায় কাদেরিয়ার কেন্দ্র বাগদাদ শরীফের আওলাদে গাউসে পাক (রাঃ) ও বর্তমান গদীনশীন মুতাওয়াল্লী সৈয়দ আবদুর রহমান জিলানী সাহেব—যিনি অধম লেখককে কাদেরিয়া তরিকার প্রচার ও বাইআতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং আমার মরহুম আব্বা ও মরহুমা আম্মার পরকালীন উচ্চমর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে আমার দশম প্রয়াস “প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাসায়েল” গ্রন্থখানী উৎসর্গ করা হলো।

বাংলা ভাষায় আক্বিদা গ্রন্থের খুবই অভাব। ইসলামী নামের ছদ্মাবরণে বর্তমানে বাংলাদেশে নতুন গজিয়ে উঠা কতিপয় বিভ্রান্ত দলের ঈমান বিধ্বংসী আক্রমণে জনগণ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। আক্বিদার এসব বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আরবী গ্রন্থের বক্ষমান অনুবাদ গ্রন্থখানী পাঠ করে বিদগ্ধ পাঠক পাঠিকাগণ উপকৃত হলে অধীন লেখককে দোয়ায় স্মরণ করার জন্য অনুরোধ রইলো।

ওলী প্রেমিক, নবী প্রেমিক ও খোদা প্রেমিক কয়েকজন ভক্তের উৎসাহে গ্রন্থখানী প্রকাশের সুযোগ পেলো এটাই তাদের বড় উৎসর্গ। যথাস্থানে তাদের নাম ও সেবা গৃহীত হোক—এই কামনাই আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে করি। আমীন।

বিনীত

গ্রন্থকার

গ্রন্থকার :

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল
কামিল, এমএ, বিসিএস

অধ্যক্ষ : কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ।

মহাসচিব : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত
সাবেক ডাইরেক্টর : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ,
ঢাকা- ১০০০।

বতীব : গাউসুল আজম জামে মসজিদ
এ/৯, শাহজাহানপুর, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা : হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা
অমিয়াপুর, পাঠান বাজার, মতলব, চাঁদপুর।

প্রকাশনায়:

ছুরী গবেষণা কেন্দ্র

১০/২৯, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা- ১২০৭। ফোনঃ ৯১১১৬০৭।

প্রকাশকাল:

১লা রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হিজরী
২৬শে জুন ১৯৯৮ইং

মুদ্রণে:-

প্রগতি প্রিন্টার্স

৪৭/২, (নতুন) আরামবাগ, ঢাকা- ১০০০,
ফোনঃ ৯৩৩৭৮৯৩

হাদীয়া:

সাদা : ১০০.০০

নিউজ প্রিন্ট : ৭৫.০০

প্রাপ্তিস্থান:

□ গাউসুল আজম জামে মসজিদ

এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

□ ছুরী গবেষণা কেন্দ্র

১০/২৯, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ৯১১১৬০৭

□ বায়তুল মোকাররম বই মেলা

আল.হেলাল প্রকাশনী।

প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা

-ঃ সুচীঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়ঃ-	পৃষ্ঠা নং
	গ্রন্থকার, প্রকাশক সৈয়দ ইউসুফ রেফায়ী ও অনুবাদকের কথা এবং পুস্তক পরিচিতি	৪
১।	প্রথম অধ্যায় : ওয়াসিলা ধরা প্রসঙ্গেঃ (আখিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামকে ওয়াসিলা ধরার পদ্ধতি, ওয়াসিলা ধরার দলীল, ইনতিকালের পর ওয়াসিলা ধরার প্রমাণ, বিপথগামীদের প্রশ্ন ও জবাব)	৯
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়- ইসতিগাসা বা রুহানী সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গেঃ (আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান, বৈধতার দলীল, ইনতিকাল প্রাপ্তদের দ্বারা উপকার লাভ করার প্রমাণ, নবীগণ স্ব স্ব রওজা মোবারকে স্বশরীরে জীবিত থাকার দলীল, শহীদ ও ওলীগনের জীবিতাবস্থার প্রমাণ)	২০
৩।	তৃতীয় অধ্যায় - তাবাররুক প্রসঙ্গে : (ব্যুৎপত্তির তাবাররুক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বৈধতা ও প্রমাণ সমূহ)	২৯
৪।	চতুর্থ অধ্যায় - মাযার ও কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে : (আখিয়া, আউলিয়া ও সাধারণের রওয়া, মাযার ও কবর যিয়ারতের বিধান ও দলীল, মহিলাদের মাযারে গমন, মহিলাদের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জবাব, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা প্রসঙ্গে বিরোধীদের আপত্তি উত্থাপন ও তার জবাব এবং হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা)	৩২
৫।	পঞ্চম অধ্যায় - কবরবাসীদের শ্রবণ শক্তি প্রসঙ্গে : (কবরবাসীগণ যিয়ারত কারীর কথা শুনে ও দেখেন, কবরবাসীদের শ্রবণ সম্পর্কিত দলীল প্রমাণ, বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি ও তার খণ্ডন)	৩৯
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায় - কবরের নিকটে কোরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে : (ইসালে সাওয়াবের দলীল, মৃতদের নিকট তিলাওয়াতের দলীল সমূহ, আমলের সাওয়াব অন্যকে দান করা প্রসঙ্গে- বাতিল পন্থীদের আপত্তি ও তার উপযুক্ত খণ্ডন, এসম্বন্ধিত আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা)	৪৩
৭।	সপ্তম অধ্যায় - মাযার পাকাও গম্বুজ করা ও হাতে স্পর্শ করা প্রসঙ্গেঃ (মাযার চূষনের হাদীস ভিত্তিক দলীল, হাতে স্পর্শ করে বরকত গ্রহণ করার প্রমাণ ও ইমামগনের ফতোয়া, বিরুদ্ধবাদীদের অপব্যখ্যা ও তার জবাব)	৫২
৮।	অষ্টম অধ্যায় - কবর তালক্বীন প্রসঙ্গে : (তালক্বীন কি? তালক্বীনের দলীল, তালক্বীনের নিয়ম)	৫৮

ক্রমিক নং	বিষয়ঃ-	পৃষ্ঠা নং
৯।	নবম অধ্যায় - আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে/ দরবারে পশু যবেহু প্রসঙ্গেঃ (মাযারে পশু যবেহু করার উদ্দেশ্য, মাযারে হাদিয়া ও নয়রানা পেশের দলীল, ইনতিকাল প্রাপ্তদের জন্য দান খয়রাত করার প্রমানাদী)	৬১
১০।	দশম অধ্যায় - আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ বা কসম করা প্রসঙ্গে : (অন্যের নামে কসম করার শরিয়তী বিধান, কবর বা কবরবাসীর নামে শপথের অর্থ)	৬৬
১১।	একাদশ অধ্যায় - কারামাত প্রসঙ্গেঃ (আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত তাঁদের জীবদ্দশায় এবং মাযারে প্রকাশ পাওয়ার দলীল, আসহাবে কাহাফ ও আসিফ বিন বারখিয়া সহ অসংখ্য অলীর কারামাত, হাদীসে কারামাতের উল্লেখ, বড়পীর সাহেবের কারামাত)	৬৭
১২।	দ্বাদশ অধ্যায় - জাযত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ প্রসঙ্গেঃ (বিভিন্ন হাদীসে জাযত অবস্থায় নবীজীর দীদারের প্রমাণ, বাতিল পন্থীদের অপব্যখ্যা খণ্ডন)	৭৪
১৩।	এয়োদশ অধ্যায় - হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকা প্রসঙ্গেঃ (হাদীসে হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার আভাস)	৭৬
১৪।	চতুর্দশ অধ্যায় - কোরআনের আমল দ্বারা রোগমুক্তি প্রসঙ্গে : (কোরআন ও হাদীসের দলীল, কোরআন ও হাদীস দ্বারা ঝাঁড় ফুঁক করা বিষয়ে ওহাবীদের বর্ণিত হাদীস ও তার সঠিক ব্যাখ্যা)	৭৮
১৫।	পঞ্চদশ অধ্যায় - মিলাদ- কিয়াম ও বিদ্আত প্রসঙ্গেঃ (মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের ইতিহাস ও প্রামানিক দলীল, মিলাদ মাহফিলের পক্ষে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য ইমামগনের রায়, বিদ্আতের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীভেদ, মিলাদ ও কিয়াম বিরোধীদের বিদ্আতের ফতোয়া খণ্ডন, হাদীস ভিত্তিক দলীল, ইমামগনের রায়)	৮২
১৬।	ষোড়শ অধ্যায় - হালকায়ে যিকির ও জলী যিকির প্রসঙ্গে : (হাদীস ভিত্তিক হালকায়ে যিকিরের প্রমাণ, জলী যিকিরের দলীল)	৯৩
১৭।	সপ্তদশ অধ্যায় - আহ্লে বাইত-এর প্রতি মহব্বৎ প্রসঙ্গেঃ (কোরআন ও হাদীসের দলীল, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উক্তি)	৯৮
১৮।	অষ্টাদশ অধ্যায় - আহ্লে বাইত-এর প্রতি বিদ্বৈষ পোষণ প্রসঙ্গেঃ (কোরআন ও হাদীসের সতর্ক বাণী)	১০৪
১৯।	উনবিংশ অধ্যায় - নবী করিম (দঃ)-এর আহ্লে বাইত-এর ফযিলত প্রসঙ্গেঃ (আহ্লে বাইতের সংজ্ঞা ও পরিচয়, আহ্লে বাইতের ফযিলত ও মর্তবা)	১০৮
২০।	বিংশ অধ্যায় - আহ্লে বাইত-এর নাজাত প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সন্দেহ খণ্ডন প্রসঙ্গেঃ (বাতিল পন্থী- নজদী অনুসারীদের একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা এবং আহ্লে হক কর্তৃক তার সঠিক ব্যাখ্যা, নবীজী শাফাআতের মালিক ও খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী)	১১৭
২০।	একবিংশ অধ্যায় : নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার উপকারিতা প্রসঙ্গেঃ	১২১

بسم الله الرحمن الرحيم

মূল কিতাব প্রকাশকের কথা

مقدمة الناشر

أحمدہ تعالیٰ واصلی و أسلم علی عبده ورسوله وحبیبہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی الہ الکرام و أصحابہ و أولیائہ من أمتہ امین .

وبعد : فإنني لما أطلعت على المخطوطة التي كتبها الأخ الحبيب العلامة الشيخ زين بن سميط ال باعلوي الحسيني الشافعي، سرتني كثيراً، ووجدتها مفيدة ونافعة، وفيها الإجابة السديدة مع الأدلة الشرعية الموثوقة من الكتاب والسنة لكثير من المسائل الخلافية التي يدور فيها النقاش بين السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة وبين الأقلية من المخالفين .

لذلك استعنت بالله تعالى على نشرها باسم (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) سائلاً المولى تعالى أن يتقبل جهد المؤلف الكريم فيما أُلِف وجهدي فيما نشرت وأن يؤلف بها القلوب والعقول على كلمة سواء بين المسلمين إنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين .

يوسف السيد هاشم الرفاعي

গ্রন্থকারের কথা

আরবী

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْهَادِي الدَّلِيلِ، وَنَسْأَلُهُ الْهَدَايَةَ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَالْحِمَايَةَ مِنَ الضَّلَالِ وَالتَّضَلُّلِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى كُلِّ خَلْقٍ جَمِيلٍ وَمَقْصِدٍ نَبِيلٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُ بِإِحْسَانٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصِيلِ .

وبعد . . . فهذه رسالة مختصرة وأجوبة مسطرة تتعلق بعقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين هم السواد الأعظم من المسلمين وضعتها على صورة السؤال والجواب ليسهل درسها على الطلاب المبتدئين وطلاب الحق السائلين والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل .

অনুবাদঃ

আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা- যিনি হেদায়াতদানকারীও পথ প্রদর্শক। তাঁর কাছেই সোজা পথের হেদায়াত প্রার্থনা করছি এবং গোমরাহী ও গোমরাহুকারী থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আমাদের মনিব ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরদ ও সালাম প্রেরণ করুন- যিনি সমগ্র সৃষ্টি ও মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আহবানকারী। তাঁর আহ্বালে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীন গনের উপরও আল্লাহু তায়াল আশ্রয় করুন। সকাল সন্ধ্যায় রহমত নাজিল করুন।

অতঃপর এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র অথচ বিস্তারিত জবাব সমৃদ্ধ। মুসলিম মিল্লাতের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাজাত প্রাপ্ত দল- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার সাথে এ পুস্তকের সম্পর্ক। আমি প্রশ্নোত্তর আকারে গ্রন্থখানি রচনা করেছি- যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সত্য পথ অনুসন্ধানীদের সুবিধে সহজ হয়। আল্লাহই একমাত্র সঠিক পথের হেদায়াত দানকারী।

(আল্লামা শেখ জাঈন ইবনে ছামীত আলভী হোসাইনী)

কুয়েত

অনুবাদঃ

আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা; আর আল্লাহর প্রিয় একক বান্দা মহান রাসুল ও প্রেমাম্পদ হাবীব এবং আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ:)- এর উপর শত সহস্র দরদ ও সালাম- যিনি সৃষ্টির মূল এবং মহান নবী। তাঁর আওলাদে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের উপরও দরদ এবং সালাম। আমিন!

অতঃপর- আমি যখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আল্লামা শায়খ জাঈন ইবনে ছামীত আলভী হোসাইনী শাফেয়ী রচিত পাণ্ডুলিপি খানা দেখলাম- তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। পাণ্ডুলিপি খানা খুবই ফলদায়ক ও উপকারী বলে আমার মনে হলো। উক্ত কিতাব খানার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ- তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং সংখ্যালঘু বিরোধী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যেসব মাস্আলা মাসায়েল বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে- সে গুলো প্রমাণ করার জন্য দাঁত ভাঙ্গা অকাট্য দলীলাদি মওজুদ রয়েছে-যা কোরআন ও সুন্নাহ হতে আহরিত হয়েছে।

একারণেই আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে উক্ত গ্রন্থখানা “মাছায়েলা কাছুরা হাওলাহান নিকাশ ওয়াল জাদাল” বা বিরোধীদের ভ্রান্তির বেড়া জালে আটকে পড়া মাসায়েল নামে প্রকাশ করার মনস্থ করেছি। মহামনিব আল্লাহু তায়ালায় কাছে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের সাধনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আর এর দ্বারা যেন সমস্ত অন্তর এবং চিন্তা চেতনাকে তিনি এক সূত্রে গ্রথিত করে দেন। মুসলমানের মধ্যে যেন আকিদার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালায় নিকটই প্রচেষ্টার উত্তম পুরস্কার আশা করা যায় এবং কাক্ষিত আশা পূরণের আস্থা রাখা যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই একক প্রাপ্য।

সৈয়দ ইউসুফ সৈয়দ হাশেম রেফায়ী-কুয়েত

السيد يوسف هاشم الرفاعي الكويت

المترجم - الحافظ محمد عبد الجليل (البنغالي)

অনুবাদকের কথা

ঈমান ও আকায়েদ- ইসলামের মূল। আমল- তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি তার শাখা। মূল ঠিক থাকলে শাখাও ঠিক থাকে। মূল নষ্ট হয়ে গেলে শাখাও নষ্ট হয়ে যায়। যার ঈমান ও আকিদা সঠিক, তার আমলও কাজে লাগবে। যার আকিদা ঠিক নেই, তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। শয়তান পৌনে সাত লাখ বছর ইবাদত করার পর যখন আদম (আ) কে অসম্মান করলো- তখন তার ঈমানও নষ্ট হয়ে গেল এবং সে কাফেরে পরিণত হলো। সাথে সাথে তার সমস্ত আমলও বরবাদ হয়ে গেল। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত- ঈমানও আকিদা ঠিক রাখা। নতুবা অজান্তে ভ্রান্ত আকিদার শিকার হয়ে যে কোন সময় ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে।

ইসলামে ৭২ টি বাতিল ফের্কা আছে। একটি মাত্র মূলদল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরামও আউলিয়ায়ে কেরামের অনুসারী দলটিই একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে এই দলটি পরিচিত। স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ৭২টি বাতিল ফের্কার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ করেছেন (তিরমিজি)। সুতরাং এসব বাতিল ফের্কা থেকে বেঁচে থাকা এবং হক দলের অনুসরণ করা কর্তব্য। যেসব আকিদা ও বিশ্বাসের কারণে বাতিল দল পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে-সেগুলো জানা দরকার। সাথে সাথে নবী করিম(দঃ), সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং মহাবাবের ইমামগন যেসব আকিদা পোষন করতেন- সেগুলো জানাও অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। তাই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে হক আকিদা পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। সত্য প্রকাশের নির্ভিক সৈনিক জনাব মোঃ আবদুল মতিন, জনাব মোহাম্মদ জামাল, জনাব মোঃ হাসেম, জনাব মোঃ আবু সাঈদ মিয়া, যারা অত্র মূল্যবান গ্রন্থখানা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন- তাদের পিতা-মাতা সহ সকল মুরুব্বীদের রুহের মাগফিরাতে এবং তাঁর জাগতিক ও পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণের জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালায় দরবারে দোয়া করছি।

-অনুবাদক

পুস্তক পরিচিতি

অনুদিত উক্ত পুস্তক খানা প্রশ্নোত্তর আকারে আরবীতে রচিত। রচনা করেছেন কুয়েতের শায়খ সাইয়েদ জাঈন ইবনে সামীত আলভী হোসাইনী শাফেয়ী। কিতাব খানার আরবী নাম রেখেছেন কুয়েতের সাইয়েদ আল্লামা ইউসুফ ইবনে সাইয়েদ হাশেম রিফায়ী “মাছায়েলা কাছুরা হাওলাহান নিকাশ ওয়াল জাদাল” অর্থাৎ “বাতিল পন্থীদের ভ্রান্তির বেড়াজালে মাছায়েল”। তিনি এর প্রকাশকও। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব কুয়েতের প্রাক্তন কেবিনেট মন্ত্রী ও সুন্নীপন্থী আলেম। তাঁর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাঃ) ৫৭৮ হিজরীতে গাউসে পাক (রাঃ) এর ইনতিকালের ১৮ বৎসর পর ইনতিকাল করেছেন। হযরত বড়গীর সহেব (রাঃ) তাঁর পরবর্তী তৃতীয় গাউস হিসাবে উক্ত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাঃ) কে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথম গাউস নিযুক্ত হয়েছিলেন সৈয়দ আদী বিন হাইতী (রাঃ)। দ্বিতীয় গাউস ছিলেন ইমাম ছারছারী (রাঃ)। ছারছারী মাত্র এদিনের জন্য গাউস নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদী বিন হাইতী ৩ বৎসর ও সৈয়দ আহমদ রেফায়ী ছিলেন ১৫ বৎসর গাউস পদে। (ফতুয়ায়ে ইমাম আহমদ রেজা (রাঃ)- সুত্র সুন্নী দুনিয়া মাসিক পত্রিকা- বেরেলী শরীফ ১৯৯৫ ইং সেপ্টেম্বর সংখ্যা)। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী (কুয়েত) বর্তমানে বাংলাদেশে খুবই পরিচিত। কেননা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রেফায়ী তরিকার প্রচার করেন এবং মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা, শেফাখানা ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে থাকেন। প্রথমে বাংলাদেশী ওহাবীরা সুন্নী সেজে তাঁকে প্রতারিত করেছে এবং কোটি কোটি টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে সুন্নীদের তৎপরতায় তাদের মুখোশ খসে পড়েছে এবং আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব তাদের থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছেন এবং সুন্নী প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি নিজেও অনেক সুন্নী কিতাব লিখেছেন- যেমন আদিলাতু আহলিছ ছুন্নাত” যা বর্তমানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি সুউদী সরকারের বাতিল আকিদা খণ্ডন করেছেন। আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী সাহেব অন্যান্য সুন্নী কিতাবও নিজ খরচে প্রকাশ করেছেন। বক্ষমান আরবী কিতাব খানা তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও ইসলামী গবেষক শায়খ সাইয়েদ জাঈন ইবনে সামীত (কুয়েত)-এর লিখিত। রেফায়ী সাহেব আমাকে উক্ত কিতাব সহ কয়েকখানা আরবী ও ইংরেজী কিতাব উপহার হিসাবে দিয়েছেন। বক্ষমান কিতাব খানা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জন্য এবং বিশেষ করে সুন্নী আন্দোলনে রত ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য- কিশোর সিরিজ হিসাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনাই আমাকে এর বাংলা অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে আরও কিশোর সিরিজ লিখার ইচ্ছা রইলো। অনুবাদের সাথে সাথে দেশের পরিবেশের সাথে গ্রন্থখানাকে সামঞ্জস্যশীল করার লক্ষে কিছু টাকা ও অতিরিক্ত দলীল সংযোজন করে এর নাম রেখেছি- “প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা”। অনুবাদ জনিত ভাষার ত্রুটি ও ছাপার ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুন্নীত্বের আলো পৌঁছিয়ে দিন। আমাদের কাজ শুধু নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত অনুবাদক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

উছীলা ধরা প্রসঙ্গ

(التَّوَسُّلُ)

প্রশ্ন : আশিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের উছীলা ধরা শরীয়ত মতে জায়েয কিনা?

উত্তরঃ আশিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছীলা ধরা, তাঁদের নিকট ফরিয়াদ করা ও সাহায্য প্রার্থনা করা- ইহকালীন ও পরকালীন- উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়ত মতে ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একমত জায়েয। আহলে সুন্নাতকে হাদীস শরীফে ছেওয়াদে আজম বা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানের দল বলা হয়েছে এবং তাঁদের অনুসরণ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। তাঁদের একমত বা ইজমা সত্যের দলীল। কেননা, অসত্যের উপর সকলে একমত হতে পারেনা। তাঁদের ইজমা ভুলত্রুটি হতে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ)-এর কয়েকখানা হাদীস শরীফ প্রনিধান যোগ্য।

১। ইমাম আহমদ ও তাব্রানী কর্তৃক রেওয়য়াতকৃত হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَاعْطَانِيهَا (إمام أحمد والطبراني)

অর্থ : আমি আমার রবের দরবারে এই ফরিয়াদ করেছি যে, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত যেন কোন বাতিল বিষয়ে একমত না হয়। আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন - (ইমাম আহমদ ও তাব্রানী)। এতে বুঝা গেল- যে বিষয়ে জমহুরে উম্মত একমত হয় -তা বাতিল নয়।

২। ইমাম হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নবী করিম (দঃ) এর বানী উদ্ধৃত করেছেন এ ভাবে-

لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا - وَوَرَدَ مَرَاهُ
الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ - (رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ)

অর্থ : “আল্লাহ্ তায়ালা আমার সমস্ত উম্মতকে গোমরাহীর বিষয়ে কখনও একমত্য করবেন না”। আরও এরশাদ করেছেনঃ “মুসলমানগনের মতে যাহা ভাল ও উত্তম, তাহা আল্লাহ্র নিকটও উত্তম বলে গন্য” (হাকেম ও তবরানী)।

এতে প্রমানিত হলো যে, সাংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত কখনও বাতিল বিষয়ে একমত্য হবেনা। সাংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগন যে বিষয়কে ভাল বলেন- তাহা আল্লাহ্র নিকটও ভাল। যেহেতু মুসলমানগনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মতেই আন্নিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা ধরা উত্তম- সেহেতু আল্লাহ্র নিকটও উহা উত্তম। ইহা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ উছিলা ধরার অর্থ কি? কিভাবে উছিলা ধরা হয়?

উত্তরঃ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগনকে স্মরণ করে তাঁদেরকে মাধ্যম বানিয়ে বরকত লাভ করার নাম উছিলা। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের কারনেই আপন বান্দাদেরকে রহম করেন। অতএব- ঐ সব নেক বান্দাগনকে উছিলা ধরার সরল অর্থ হচ্ছে- তাঁদেরকে মাধ্যম বা চ্যানেল ধরে মনোবাঞ্ছা পূরনের জন্য এবং মাকসুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ্ তায়ালাকে কাছে প্রার্থনা করা। কেননা, তাঁরা আমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অতি নিকটে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একখানা হাদীস শরীফ উল্লেখযোগ্য। যথাঃ

বোখারী শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা পক্ষ হতে একখানা হাদীসে কুদসী উল্লেখ করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ
وَمَا تَقْرَبُ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ
عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي
يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ
وَلَنْ أَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيْذَنَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থ : “আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ যে কেউ আমার কারনে আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষন করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় যে ইবাদত করে- তা হচ্ছে আমার নির্ধারন- কৃত ফরজ ইবাদত। আর তার ইচ্ছাকৃত নফল ইবাদতের মাধ্যমেও ক্রমশঃ বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যায়। আর যখন সে আমার বন্ধু হয়ে যায়- তখন আমি তার শ্রবন শক্তি (কান) হয়ে যাই -যার মাধ্যমে সে শুনতে পায়। আমি তার দৃষ্টিশক্তি (চোখ) হয়ে যাই - যার মাধ্যমে সে দেখতে পায়। আমি তার ধারণ শক্তি (হাত) হয়ে যাই- যার মাধ্যমে সে ধরে। আমি তার চলনশক্তি (পা) হয়ে যাই - যার মাধ্যমে সে চলাচল করে। আর যদি সে আমার কাছে কিছু চায়- তবে অবশ্যই আমি তাকে তা দেই। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই তাঁকে আমি আশ্রয় দেই”। -বোখারী শরীফ।

এতে প্রমানিত হলো- আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার ডাক আল্লাহ্ শুনেন। তাঁরা আল্লাহ্ তে মিশে যান (ফানা হয়ে যান)। তাদের মধ্যে খোদা প্রদত্ত (কুদরতি) শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, ধারণ শক্তি ও চলনশক্তি এসে যায়। এগুলোকে কারামত বলে। অতএব- তাঁদের সুপারিশ আল্লাহ্ কবুল করেন। যেমন- লোহা আগুন নয়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এলে সে আগুনের শক্তি লাভ করে। তখন সেও আগুনের ন্যায় জ্বালাতে পারে। অদ্বৈত- আল্লাহ্র অলীগন আল্লাহ্ নহেন। কিন্তু ফানা ফিল্লাহ্ হয়ে গেলে খোদায়ী কুদরতি শক্তি লাভ করেন। তারা খোদার নিকট যা চান- তা পান। সেজন্যই লোকেরা মাজারে যান- অনুবাদক।

প্রশ্ন : আন্নিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে উছিলা ধরার কোন দলীল প্রমান আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আছে। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা এর প্রমান পাওয়া যায়। যথাঃ-

১। ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাছায়ী, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাবরানী সহীহ সনদের মাধ্যমে সাহাবী হযরত উসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ-

ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله ان يكشف عن بصري فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فامرته صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فيحسن وضوؤه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة-يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي-اللهم شفعي في فذهب ثم رجع وقد كشف الله عن بصره-وفى رواية البيهقي فقام وقد ابصر-

অর্থ : “ওসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) বলেনঃ এক অন্ধ সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলো- ইয়া রাসুল্লাহ। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন- যেন তিনি আমার অন্ধত্ব দূর করে দেন। হুজুর আকরাম (দঃ) তাঁকে বললেন- যদি তুমি চাও, তাহলে আমি দোয়া করবো। আর যদি ইচ্ছা করো, তাহলে সবার করতে পারো। এটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উক্ত সাহাবী বললেন- বরং আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। তাঁর অনুরোধে নবী করিম (দঃ) তাঁকে উত্তমরূপে অজু করে এই দোয়া পড়তে শিখিয়ে দিলেন-” হে আল্লাহ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার নবী- যিনি রহমতের নবী-সেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম -কে উছালা করে তোমার দিকে আমি মুতাওয়াজ্জাহ (মনোযোগী) হলাম। হে প্রিয় মুহাম্মদ (দঃ), আমি আমার এই মাকসুদ পূরনের জন্য আপনার মাধ্যমে (উছালায়) আল্লাহর দিকে

মুতাওয়াজ্জাহ হলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার মাকসুদ পূরনের ব্যাপারে হুজুর (দঃ)-এর সুপারিশ কবুল করো।” এই দোয়া করে ঐ সাহাবী চলে গেলেন। তারপর পুনরায় ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ তাঁর চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে- উক্ত সাহাবী উঠে দাঁড়াতেই তাঁর চক্ষু ভাল হয়ে গেলো।” (তিরমিজি, নাছায়ী, বায়হাকী, তাবরানী)

পর্যালোচনাঃ এই হাদীসের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- অন্ধত্ব দূর করার জন্য সাহাবী একবার আল্লাহকে সম্বোধন করেছেন। আর একবার রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে সম্বোধন করা জায়েয। হাদীস বিশারদগণ বলেছেনঃ এই হাদীসে নবী করিম (দঃ) কে উছালা করে দোয়া করা এবং নবী করিম (দঃ) কে সম্বোধন করে ডাক দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দোয়া এত্তেমাল করেছেন-সাহাবায়ে কেরাম, তাবায়ীন, সলফে সালেহীন ও পরবর্তী বুয়ুর্গানে দ্বীন- তাঁদের মাকসুদ পূরনের জন্য।

উক্ত হাদীসে আরও প্রমানিত হয় যে- নবীজির জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকাল পরবর্তী সময়ে যাদের চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিলো, সেসব বুয়ুর্গানে দ্বীন উপরোক্ত আমল করে সকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এতে প্রমানিত হলো- হুজুর (দঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও তাঁকে উছালা ধরা যায়। সত্যি কথা এই- হুজুর (দঃ)-এর আগমনের পূর্বেও সকল নবী এবং সকল উম্মত তাঁর পবিত্র নামের উছালা ধরেই বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। যেমনঃ হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল, নূহ (আঃ)-এর কিস্তি বাড়ি তুফান থেকে রক্ষা পাওয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভ- ইত্যাদি। এগুলো নবীযুগের হাজার হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুতরাং উছালা ধরা শুধু জায়েযই নয়- বরং নবীগণেরই ছন্নাত -অনুবাদক।

২। কোন সাহাবী বা ওলীর উছালা ধরার প্রমাণ নিম্ন বর্ণিত হাদীস খানা - যা বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছেঃ-

عن انس رضى الله عنه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال

অর্থ : “জীবদ্দশায় যার কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয, ইনতিকালের পরেও তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয”-(ইহুইয়াউল উলূম এবং আল- বাছায়ের)-অনুবাদক।

প্রশ্নঃ ইনতিকালের পর কাউকে উছিলা ধরার কোন বাস্তব প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন- ওহাবী সম্প্রদায়েরই নেতা ইবনে কাইয়েম তার যাদুল মাআদ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেনঃ-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايْ هَذَا إِلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلَا أَشْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضَى صَلَاتُهُ- (زَادُ الْمَعَادِ)

অর্থ : “হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবার সময় এই দোয়া পাঠ করবেঃ “হে আল্লাহ! প্রার্থনাকারীগণের যে মর্যাদা তুমি দিয়েছো-তাদের সে মর্যাদার উছিলা ধরে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আরও উছিলা ধরছি- তোমার পথে আমার এই চলাকে। কেননা, আমি তো অহঙ্কার করার জন্য বা খারাপ উদ্দেশ্যে, লোক দেখানো বা সুনাম অর্জনের জন্য বের হয়নি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তোষ

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ- (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থ : হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত - তিনি বলেনঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে যখন অনাবৃষ্টির কারনে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রাঃ) কে উছিলা করে খোদার কাছে বৃষ্টি কামনা করতেন এবং ইস্তিস্কার নামাজ পড়তেন। হযরত ওমর (রাঃ) এভাবে দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ, এতদিন আমরা নবী করিম (দঃ)-এর উছিলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করতাম। বর্তমানে নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) কেও উছিলা করে তোমার কাছে বৃষ্টি কামনা করছি। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও”। হযরত আনাছ (রাঃ) বলেনঃ এভাবেই লোকেরা বৃষ্টি পেতো - বুখারী।

হাদীস বিশারদ উলামা ও ইমামগন বলেছেনঃ এই হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, বুয়ুর্গানে দ্বীনের উছিলা করে দোয়া করা হযরত ওমরের (রাঃ) ছল্লাত। কেননা, হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন রাসূল (দঃ)-এর চাচা এবং বিশিষ্ট সাহাবী। লোকেরা তাঁকে উছিলা করে বৃষ্টি প্রার্থনা করার সাথে সাথে বৃষ্টিপাত হতো। নবীজীর বংশের গুন এবং বুয়ুর্গীর মর্যাদা আল্লাহর নিকট অতি উচ্চ।

প্রশ্নঃ ইনতিকাল প্রাপ্ত কাউকে উছিলা ধরা যায় কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ। ইনতিকালের পরও কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে উছিলা ধরা যায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম (রহ:) পরীক্ষার করে বলে দিয়েছেন যে, উছিলা ধরার ক্ষেত্রে হায়াত- মউত্তের মধ্যে কোন পাথক নেই। ইমাম গাজজালী (রাঃ) বলেছেন-

مَنْ يَسْتَمِدُّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ يَسْتَمِدُّ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (أَحْيَاءُ الْعُلُومِ-الْبَصَائِرُ-حَمْدُ اللَّهِ الدَّاجِوِي)

نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحُوهُ)

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমার মা (চাচী) ফাতেমা বিন্তে আছাদ (রাঃ) কে মাফ করে দাও, তাঁর জন্য তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তোমার প্রিয় নবী (আমি) ও আমার পূর্ববর্তী সকল আশ্বিয়ায়ে কেরামের উছিয়ায় আমার চাচীর মাগফিরাত কর"। (ইবনে হিব্বান, হাকেম ও তাবরানী)

পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! আপনারা নবী করিম (দঃ)-এর দোয়ার ঐ অংশ টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন- যেখানে তিনি বলেছেনঃ আমার পূর্ববর্তী আশ্বিয়ায়ে কেরামের উছিয়ায় ক্ষমা কর। এখানে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পূর্ববর্তী নবীগন অবশ্যই ইনতিকাল প্রাপ্ত এবং তাঁদের উছিয়া দিয়ে দোয়া করাও জায়েয। বাতিল সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা উছিয়া ধরা- স্বীকার করে নাও -ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

(বিপথগামীদের প্রতি সতর্কবানী)

বিপথগামী লোকেরা বলে থাকে- হযরত ওমর (রাঃ) নবীজীর উছিয়া না ধরে তাঁর যুগে জীবিত হযরত আব্বাস (রাঃ) কে উছিয়া ধরেছেন। এতে বুঝা যায়- মৃত কাউকে উছিয়া ধরা জায়েয নেই (নাউজু বিল্লাহ)।-১৩ পৃষ্ঠার হাদীস দেখুন।

জবাব : হাদীস বিশারদ ওলামাগন বলেছেন- বিপথগামীরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করেছে। বরং উক্ত হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে এইঃ হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) কে উছিয়া করে একথাই বুঝিয়েছেন যে, নবীজী ছাড়াও ঐ সব লোককে উছিয়া ধরা যায়- যারা নবীজীর অতি নিকটের এবং আত্মীয়স্বজন। সুতরাং পাক পাঞ্জাতন ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিয়া ধরার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো- হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্ত আমল। অন্যান্য সাহাবীগনকে উছিয়া না ধরার মধ্যে কারন হলো- নবীজী ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণের বুয়ুগী ও মর্তবা আল্লাহর কাছে কত বেশী- তা প্রকাশ করা। ওহাবীদের প্রতারনামূলক ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা- তা অন্য একটি হাদীস দ্বারাও প্রমানিত হয়েছে। যেমনঃ-

প্রশ্নোত্তরে আকাইদ-১৬

থেকে বাঁচবার জন্য এবং তোমার রেজামন্দি তলব করার জন্য। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি- তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো এবং আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করো। তুমি ব্যতিত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ এভাবে দোয়া চাইলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়োজিত করে দেন। ঐ ফেরেস্তারা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টি দিয়ে) তাকিয়ে থাকেন- যতক্ষন না সে নামাজ শেষ করে"। (যাদুল মাআদ- ইবনে কাইয়েম ওহাবী ও ইবনে মাজা)। এখানে প্রার্থনাকারী বলতে জীবিত ও মৃত সকলকেই বুঝানো হয়েছে। কাজেই ইনতিকালের পর কাউকে উছিয়া ধরা জায়েয প্রমাণিত হলো।

২। ইমাম বায়হাকী, ইবনে সুন্নী, হাফেজ আবু নোয়াইম প্রমুখ মোহাদ্দেস ও ইমামগন নবী করিম (দঃ)-এর নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময়ের দোয়া এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ

অর্থ : "হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনাকারীদের যে মর্যাদা রয়েছে, সে মর্যাদার উছিয়া দিয়ে আমি প্রার্থনা করছি"। (বায়হাকী, ইবনে সুন্নী, আবু নোয়াইম)।

পর্যালোচনাঃ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ওলামাগন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জীবিত অথবা ইনতিকাল প্রাপ্ত -যে কোন প্রার্থনাকারী মোমেন বান্দার উছিয়া ধরা পরিষ্কার ভাবে জায়েয। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত দোয়া পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অতীত যুগের সকল বুয়ুগানে দ্বীন নামাজে যাওয়ার সময় উক্ত দোয়া এস্তুমাল করতেন। কাজেই ইনতিকাল প্রাপ্ত আশ্বিয়া ও আউলিয়া - এমনকি জীবিত মুমিন বান্দাদের উছিয়া ধরাও শরীয়ত মতে জায়েয এবং সুন্নাত।

৩। ইবনে হিব্বান, হাকেম ও তাবরানী সহীহ সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (কঃ) -এর মা হযরত ফাতেমা বিন্তে আছাদ (রাঃ) যখন ইনতিকাল করেন (৩য় হিজরী) তখন নবী করিম (দঃ) তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করেছেনঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَ وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ

৩। নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত যুগে জনৈক সাহাবী বেলাল ইবনে হারেছ রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওজা মোবারকে গিয়ে বৃষ্টির জন্য হুজুর(দঃ)-এর খেদমতে প্রার্থনা করেছিলেন। ইমাম বায়হাকী, ইবনে আবি শায়বা প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ সহীহ সনদের মাধ্যমে এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফখানা বর্ণনা করেছেনঃ-

أَنَّ النَّاسَ قَحِطُوا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا فَاتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ إِنَّتِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَقْرَنُهُ السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ فَاتَاهُ وَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَقَوْا- (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

অর্থ : “মদিনাবাসীগণ একবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে অনাবৃষ্টির কারনে দুর্ভিক্ষে পতিত হন। হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর রওজা মোবারকে গিয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনার উম্মতেরা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। আপনি তাঁদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। অতঃপর রাতে স্বপনে এসে নবী করিম (দঃ) বেলাল (রাঃ) কে বললেনঃ তুমি ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে আমার সালাম জানিয়ে বলো- তাঁরা বৃষ্টি পাবে। স্বপ্ন দেখে বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে এ শুভ সংবাদ দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ সংবাদ শুনে কেঁদে ফেললেন। মদিনাবাসীগণ রহমতের বৃষ্টি লাভ করলেন”। (বায়হাকীও ইবনে আবি শায়বা)

ফায়দাঃ বর্ণিত হাদীসে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য। যথাঃ -

ক) ইনতিকালের পর নবী করিম (দঃ) কে ইয়া রাসুলুল্লাহ বলে সম্বোধন করা জায়েয। যেমন-সম্বোধন করেছিলেন হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ)।

খ) বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করা সুন্নাত।

গ) ইনতিকালের পর নবী করিম (দঃ) কে উছীলা করে বৃষ্টির প্রার্থনা করা উত্তম।

ঘ) হযরত বেলাল (মোয়াজ্জিন বেলাল নহেন) একজন সাহাবী। তাঁর উক্ত কাজে হযরত ওমর (রাঃ) অথবা অন্য কোন সাহাবী কর্তৃক আপত্তি না করাই বৈধতার প্রমাণ।

চুড়ান্ত ফতোয়াঃ ইনতিকালের পর কোন নবী অথবা অলীগনকে উছীলা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা- শুধু জায়েযই নয়, বরং সাহাবীগনের সুন্নাতও বটে। -অনুবাদক

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইস্টিগাসা (সাহায্য প্রার্থনা করা) প্রসঙ্গ

الْإِسْتِغَاثَةُ

প্রশ্নঃ ইস্টিগাসা (إِسْتِغَاثَةُ) অর্থ কি?

উত্তরঃ ইস্টিগাসার (إِسْتِغَاثَةُ) অর্থ- কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং বিপদে ও বালা মুসিবতে তাঁর উছলায় মুক্তিলাভ করা ও বিপদ দূর হওয়া।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ অবশ্যই জায়েয আছে। কেননা, আল্লাহ্র বান্দাগন হচ্ছেন উপলক্ষ্য ও উছলা মাত্র। তাঁদের উছলায়ই আল্লাহ্ সাহায্য করেন ও বিপদ দূর করেন। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ম-নীতি হচ্ছে- কোন ফেরেশতা বা বান্দার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা। যেমনঃ ফেরেশতার মাধ্যমে শিশুর রুহ প্রদান করা, বান্দার হেফাজত করা, বৃষ্টি নাজিল করা, মেঘমালা তৈরি করা ও পরিচালনা করা, রিজিক বন্টন করা, মৃত্যু দান করা, ডাক্তার ও ঔষধের মাধ্যমে রোগ দূর করা, সূর্যের তাপের মাধ্যমে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখা, নবী ও অলীগনের মাধ্যমে লোকদের হেদায়াত দান করা, পিতা মাতার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করা- ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে উপলক্ষ্য। এগুলোকে স্বীকার করে নেয়ার নামই ঈমান। -অনুবাদক।

অসংখ্য দলীল দ্বারা এগুলো প্রমানিত। যেমনঃ-

১। মুসলিম শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ -

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

অর্থঃ “আল্লাহ্ তায়ালা ততক্ষণ ঐ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে” (মুসলিম শরীফ)।

২। আবু দাউদ শরীফে হাদীস বর্ণিত আছে- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ-

أَنْ تَغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ (رواه أبو داود)

অর্থঃ “তোমরা বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য করো এবং পথহারাকে রাস্তা প্রদর্শন করো” (আবু দাউদ)।

উক্ত দুটি হাদীসে অন্যকে সাহায্য করা ও পথহারাকে পথ প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং সাহায্যের জন্য কেউ উপলক্ষ্য হওয়া জায়েয।

প্রশ্নঃ ইস্টিগাসা বা মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার শরীয়তী দলিল ও প্রমাণ কি কি?

উত্তরঃ বিপদে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বহু দলীল আছে। যথাঃ-

১। বোখারী শরীফে কিয়ামতের দিনে হাশরবাসীগন কর্তৃক নবীগনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

رواه البخاري في كتاب الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بأدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بـعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم- الحديث-

অর্থঃ ইমাম বোখারী (রহঃ) জাকাত অধ্যায়ে একখানা দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেছেন। ঐ হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিনে সূর্য এত কাছে আসবে যে, তার তাপে মানুষের ঘাম বের হয়ে সাগর হয়ে যাবে। এমনকি এ ঘাম মানুষের কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলবে (গুনাহ্গারদের বেলায়)। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে অবশেষে হাশর বাসীগন সাহায্যের জন্য নবীগনের কাছে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে।

একে একে তারা হযরত আদম, হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুছা, হযরত ইছা আলাইহিমুস সালামগনের নিকট সাহায্যের জন্য যাবে। সকলেরই এক জবাবঃ-আমরা অক্ষম- **لَسْتُ لَهَا**। অবশেষে সকলে মিলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট গিয়ে সাহায্যের আবেদন করবে। নবী করিম (দঃ) বলবেনঃ **أَنَا لَهَا** অর্থাৎ আমিই সুপারিশকারী "(রুখারী)।

উক্ত হাদীসে প্রমানিত হয়েছে যে, সমস্ত হাশর বাসীগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আশিয়ায়ে কেরামের কাছে এই সাহায্য চাইবে। আল্লাহ তায়ালা ইশারাতেই তারা এ কাজ করবে। অবশেষে নবী করিম (দঃ)-এর কাছে গিয়ে তারা উপকৃত হবে। এই হাদীস খানাই এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় দলীল যে, দুনিয়া ও আখিরাতে ঘোর বিপদের দিনে নবীগনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা সুন্নাত। দুনিয়াতে ওহাবীরা যে কাজকে শিরক বলতো- সে কাজ দিয়েই আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন (অনুবাদক)।

২। ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন - নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ (أَيَّ عَنِ الطَّرِيقِ) وَارَادَ عَوْنًا وَهُوَ بَارِضٌ لَيْسَ فِيهَا أَنْيْسٌ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اغِيثُونِي وَفِي رِوَايَةٍ أُعِيْنُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَوْنَهُمْ - (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

অর্থ : “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে অথবা সে এমন জায়গায় পৌঁছে- যেখানে কোন সাহায্যকারী না থাকে, তাহলে সে যেন এ কথা বলেঃ হে আল্লাহর গোপন বান্দাগন। আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন - যাঁদেরকে তোমরা দেখনা”। ইনিরা রিজালুল গায়ব নামে পরিচিত। (তাবরানী শরীফ)

উক্ত হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হলো যে, অদৃশ্য বান্দাগনকে সম্বোধন করা এবং তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।

৩। মক্কা মোয়াজ্জমার তৎকালীন মুফতী সাইয়েদ আহমদ ইবনে জাইনী দাহলান মক্কী (রাঃ) ফতোয়া দিয়েছেন যে- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে ইনতিকাল প্রাপ্ত অথবা জীবিত অলী-আল্লাহগনের কাছে সাহায্য চাওয়া ও তাঁদেরকে উছিলা ধরা সম্পূর্ণ

জায়েয। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি যে, মূল তাহির ও উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহর হাতে। কিন্তু আশিয়া ও আউলিয়াগনের নামের উছিয়ায় ও বরকতে আল্লাহ তায়ালা উপকার - অপকার সংঘটিত করেন। কেননা, তাঁরা আল্লাহর মাহবুব বান্দা।

যারা জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয মনে করে, কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া নাজায়েয বলে- তারা মনে করে যে, জীবিতদের মধ্যে ক্ষমতা আছে, কিন্তু মৃতদের মধ্যে নেই। এটা তাদের ভুল ধারণা। উপকার ও অপকার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (খুলাসাতুল কালাম)।

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা কি পৃথিবীতে আমাদের কোন উপকার সাধিত হয়?

উত্তরঃ হাঁ। মৃত ব্যক্তির জীবিত ব্যক্তিকে উপকার করতে পারেন। দলীলের মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে যে- মৃত ব্যক্তির জীবিতদের জন্য দোয়া করেন এবং সুপারিশ করেন। সাইয়েদুনা শায়খ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলভী হাদ্দাদ (রহঃ) বলেছেনঃ -

إِنَّ الْأَمْوَاتَ أَكْثَرُ نَفْعًا لِلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ لَهُمْ لَأَنَّ الْأَحْيَاءَ مَشْغُولُونَ عَنْهُمْ بِهِمُ الرِّزْقِ وَالْأَمْوَاتُ قَدْ تَجَرَّدُوا عَنْهُ وَلَهُمْ هُمُ الْإِفِيمَا قَدَمُوهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لَا تَعْلُقُ لَهُمُ الْإِبْذَلُكَ كَالْمَلَائِكَةِ

অর্থ : “জীবিত লোকেরা মৃত লোকদের জন্য যা উপকার করতে পারে, মৃত ব্যক্তি ব্যক্তির তার চেয়েও বেশী উপকার করতে পারেন- জীবিত লোকদের জন্য। কেননা, জীবিত লোকেরা রিজিকের ধান্দায় মশগুল থাকে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির রিজিকের ধান্দা হতে মুক্ত। তাঁরা শুধু নিজেদের প্রেরিত নেক আমলের চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন। ফেরেশতাদের ন্যায় তাঁদের একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে -নেক আমলের সাথে”।

প্রশ্ন : আচ্ছা ! মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে জীবিত লোকের উপকার প্রাপ্তির কি কি দলীল আছে?

উত্তরঃ ইনতিকালের পর জীবিত লোকদের উপকার করার বহু দলীল আছে। তন্মধ্যে তিনখানা হাদিসই যথেষ্ট। যথাঃ

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) তাঁর মসনদে মৃত আত্মীয় স্বজন কর্তৃক উপকার করার একখানা হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تَعْرَضُونَ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبَشَرُوا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تَمَتِّهِمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ)

অর্থ : “হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল ও মন্দ যাবতীয় আমল তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় লোকদের নিকট পেশ করা হয়। যদি তাঁরা তোমাদের আমল ভাল দেখেন, তখন খুশী হন। আর যদি অন্য রকম দেখেন, তখন বলেন- হে আল্লাহ! তাদেরকে মৃত্যু দিওনা। বরং এর পূর্বেই তাদেরকে হেদায়াত দান কর- যেমন হেদায়াত দান করেছিলে আমাদেরকে” (ইমাম আহমদ)।

উক্ত হাদীসে দেখা যায়- মৃত আত্মীয়গণ জীবিত আত্মীয়দের হেদায়াতের জন্য দোয়া করে জীবিত ব্যক্তিদের উপকার করেন।

২। ইমাম বাজজার সহীহু রেওয়ায়াতে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক উম্মতের উপকার সাধনের একখানা হাদীস নিম্নে বর্ণনা করেছেনঃ-

رَوَى الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تَحْدَثُونَ وَيُحَدِّثُكُمْ لَكُمْ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تَعْرَضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَارَ آيَتٌ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَفْغَرْتُ لَكُمْ-

অর্থ : ইমাম বাজজার বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে নবী করিম (দঃ) এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ “আমার হায়াত-মউত তোমাদের উপকারের ক্ষেত্রে এক সমান। আমার হায়াতে জিন্দেগীতে তোমাদের যে কোন উদ্ধৃত ঘটনা ও সমস্যার সমাধান সাথে সাথেই হয়ে যায়। ইনতিকালের পর তোমাদের যাবতীয় আমল আমার দৃষ্টিতে আনা হবে। তোমাদের ভাল আমল দেখলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর কোন খারাপ আমল দেখলে তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবো”। (সুতরাং আমার হায়াত-মউতে আমি তোমাদের উপকারই করে থাকি)।

হাদীস বিশারদগণ বলেন- গুনাহ্‌গার উম্মতের আমল প্রত্যক্ষ করে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তার জন্য মাগফিরাত কামনা করার চেয়ে বড় উপকার আর কি হতে পারে? সুতরাং প্রমানিত হলো- ইনতিকালের পর জীবিতদের উপকার করা হাদীসের দ্বারাই প্রমানিত।

৩। সহীহু বোখারীতে বর্ণিত হাদীসে মেরাজ শরীফের রাতে হযরত মুছা (আঃ)-এর সাথে আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সাক্ষাত এবং তার অনুরোধে নবী করিম (দঃ) বার বার আল্লাহর দরবারে গিয়ে উম্মতের নামাজের সংখ্যা কমিয়ে পঞ্চাশের মধ্যে মাত্র পাঁচ ওয়াস্ত নির্ধারিত করার মধ্যেই সব চেয়ে বড় প্রমান পাওয়া যায় যে, ইনতিকাল প্রাপ্ত হযরত মুছা (আঃ) সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য কত বড় উপকার করেছেন। মে'রাজের ঘটনার আড়াই হাজার বছর পূর্বে হযরত মুছা (আঃ) ইনতিকাল করেছেন। অথচ ইনতিকালের দীর্ঘদিন পর নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে তিনি আমাদের এবং সকল উম্মতে মোহাম্মাদী (দঃ)-এর বিরাট উপকার সাধন করেছিলেন। এমন কি- যারা ঢালাও ভাবে সকল মৃতকে অনুপকারী বলে দাবী করে, তারাও মুছার (আঃ) এই উপকার মেনে নিয়েই দৈনিক পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ পড়ছেন। তারা মুছা নবীর উপকার অস্বীকার করে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াস্ত নামাজ পড়তে রাজী আছেন কি? (হাদীস খানা দীর্ঘ বলে আরবী এবারত উদ্ধৃত করা হলনা)।-অনুবাদক

প্রশ্ন : আচ্ছা! নবীগণ (আঃ) কি তাঁদের মাযার ও রন্তযা মোবারকে এখনও স্বশরীরে জীবিত আছেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ! সকল নবীগণই নিজ নিজ রন্তযা মোবারকে শুধু জীবিতই নন, বরং তাঁরা রন্তযা পাকে (শুকুরিয়ার) নামাজ আদায় করছেন এবং হজ্বও সম্পাদন করছেন। হাদীস বিশারদ উলামাগণ বলেছেনঃ পরকালে যদিও শরীয়তী বিধান তাঁদের উপর বাধ্যতা মূলক

নয়, তবুও তাঁরা প্রভু প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ইবাদত ও আমল করে থাকেন। সুতরাং কোন কুটতর্কিকের প্রশ্ন উত্থাপন করার আর কোন অবকাশই নেই।

প্রশ্ন : আখিয়ায়ে কেরামগন যে নিজ নিজ রক্তযা পাকে স্বশরীরে জীবিত আছেন- তার কি কোন যথার্থ দলীল প্রমান আছে?

উত্তর : হ্যাঁ! অনেক দলীল আছে। যথাঃ

১। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেন :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ মে'রাজের রাতে আমি মুছা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছি। তিনি লাল পাথরের নিকট দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন”।

হযরত মুছা (আঃ) স্বশরীরে জীবিত আছেন বলেই- দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছিল। নামাজ পড়তে সিজদাকালে অষ্ট অঙ্গের প্রয়োজন হয়। কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাট, দুই পা-মোট আটটি অঙ্গ দিয়ে সিজদা করতে হয়। সুতরাং হযরত মুছার (আঃ) স্ব-শরীরে নামাজ আদায় করা প্রমানিত হলো।

২। ইমাম বায়হাকী ও আবু ইয়ালা হযরত আনাস (রাঃ)-এর আর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথাঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ- قَالَ الْمَنَائِيُّ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ-

অর্থ : “হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আখিয়ায়ে কেরাম আলাইহিযুস সালাম নিজ নিজ রক্তযা পাকে নামাজ আদায় করছেন এবং ভবিষ্যতেও আদায় করতে থাকবেন”। (বায়হাকী)

হাদীস বিশারদ আল্লামা মানাজী (রহঃ) বলেন- হাদীসখানা সহীহ (প্রথম শ্রেণীভুক্ত হাদীস)

৩। তাবরানী শরীফে হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ- رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضٍ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আখিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারক মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

(মাটি নবীগনের ইহজগতের দেহ মোবারক নষ্ট করতে পারবেনা- তাঁরা অক্ষত দেহ নিয়ে রওযা পাকে জীবিত। নবী করিম (দঃ) ও অক্ষত অবস্থায় দুনিয়ার দেহ নিয়েই রওযা পাকে স্ব-শরীরে জীবিত আছেন-(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত)।

৪। কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা শহীদগনের জীবিত থাকার কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ- بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (بَقْرَة) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا- بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آلِ عِمْرَان)

অর্থ : “তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদগনকে মৃত বলনা- বরং তাঁরা জীবিত; কিন্তু তোমরা তাঁদের জীবিত থাকার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত নও”। (সূরা বাক্বারা)

“যাঁরা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে গেছেন- তাদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করোনা- বরং তাঁরা জীবিত। আপন প্রভুর নিকট থেকে তাঁরা রিজিক পেয়ে থাকেন”। (আলে ইমরান)

উল্লেখ্য যে, শহীদগনকে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে তৃতীয় সারিতে স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন সিদ্দীকগনকে এবং প্রথম স্থানে আখিয়ায়ে কেরামকে। (সূরা নিসা)

হাদীস ও তাফহীর বিশারদ এবং বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তৃতীয় পর্যায়ের শহীদগণ যদি কবরে জীবিত থাকেন- তাহলে সিদ্দীকীন ও আহ্মিয়ায়ে কেরামের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রশ্নাতীত ভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। (তাফসীরে নাস্খী)।

৫। হযরত ওমর (রাঃ) রওযা মোবারকে জিন্দা আছেন- এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেনঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ ادْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي وَإِنِّي وَأَضَعُ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي- فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمَا فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ الْآوَانَ مَشْدُودَةً عَلَى ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ)

অর্থ : “হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমার হুজুরার মধ্যেই হযরত রাসূল করিম (দঃ) এবং আমার পিতা আবু বকর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক অবস্থিত থাকার কারণে আমি যিয়ারত কালে অতিরিক্ত আবরন ছাড়াই রওযা পাকে প্রবেশ করতাম। আমি মনে মনে বলতাম - ইনি হচ্ছেন আমার প্রিয় স্বামী (হযরত নবী করিম দঃ) এবং উনি হচ্ছেন আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ)। যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে উনাদের পাশে দাফন করা হলো (২২ হিজরীতে), খোদার শপথ করে বলছি- তখন থেকে আমি অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে পর্দা না করে প্রবেশ করতাম না। কেননা, হযরত ওমর (রাঃ) কে দেখে আমি লজ্জা পেতাম”। (ইমাম আহমদ)

উক্ত হাদীস পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে দেখতে পেতেন- বলেই হযরত আয়েশা (রাঃ) লজ্জা পেতেন এবং পর্দা করে যিয়ারত করতেন। এতে উভয়েরই কারামত প্রতিফলিত হচ্ছে। নিজ ঘরে হযরত আয়েশা-(রাঃ)-এর এই অবস্থা। আজকাল নারীরা বিনা পর্দায় অলীআল্লাহদের মাযারে যাচ্ছেন। তাদের লজ্জা থাকা উচিত এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। (অনুবাদক)

তৃতীয় অধ্যায়

তাবারক প্রসঙ্গ (التَّبَرُّكُ)

প্রশ্ন : বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভ করা জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। শুধু তাই নয়; বরং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এসব দ্বারা বরকত হাসিল করাও মোস্তাহাব।

প্রশ্ন : মোস্তাহাব হওয়ার দলীল প্রমাণ কি?

উত্তর : বুযুর্গানে দ্বীনের নিদর্শন সমূহের দ্বারা বরকত লাভ করার বহু দলীল প্রমাণ মওজুদ আছে। যেমনঃ

১। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاطَّافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةُ الْإِفَى يَدْرَجُلْ-فَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَحْتَفِظُونَ بِشَعْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّبَرُّكِ وَالْإِسْتِشْفَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ : “হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- আমি দেখেছি, মাথা মুণ্ডনকারীরা নবী করিম (দঃ) এর মাথা মোবারক (মিনাতে) মুণ্ডন করছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর চার পাশে ঘুর ঘুর করছিলেন উক্ত চুল মোবারক সংগ্রহ করার জন্য। যখনই চুল মোবারক নীচে পড়তো, তখন কোন না কোন সাহাবীর হাতেই পড়তো। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) (রাঃ) তাঁর চুল মোবারক যত্ন সহকারে হেফাজত করে রেখে দিতেন বরকত লাভ করার জন্য এবং রোগমুক্তির জন্য” (মুসলিম শরীফ)।

এতেই প্রমানিত হলো যে, কোন মহান লোকের নিদর্শন দ্বারা বরকত লাভ করা ও রোগমুক্তি কামনা করা মোস্তাহাব।

২। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু যোহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبِّهِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الرُّضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بِلَالٍ صَاحِبِهِ يَغْنَى لِلتَّبَرُّكِ وَالْإِسْتِشْفَاءِ-

অর্থ : “হযরত আবু যোহাইফা (রাঃ) বলেন- আমি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি লাল গন্ধমী রংয়ের কাপড় পরিহিত ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম - হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর অবশিষ্ট অজুর পানি নিয়ে এসেছেন। লোকেরা উক্ত অজুর পানি সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন। যারা কিছু পানি পেয়েছেন, তাঁরা উক্ত পানি দ্বারা শরীর মুছে নিচ্ছেন, আর যাঁরা পানি নি, তাঁরা আপন সাথীর ভিজা স্থান স্পর্শ করে উহাই শরীরে মালিশ করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ বরকত লাভ করা ও রোগমুক্তির উদ্দেশ্যেই তাঁরা এরূপ করছিলেন”। (বোখারী শরীফ)

এতেও প্রমানিত হলো - বুজুর্গানে দ্বীনের অজুর পানি বরকত হিসাবে এবং রোগমুক্তির আশায় সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা মোস্তাহাব। -অনুবাদক

৩। বোখারী শরীফে আস্মা বিন্তে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جَبَّةَ طَيَّالِسَةَ وَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَلْبِسُهَا فَتَنْحَنُ نَفْسُهَا لِلْمَرْضَى يَسْتَشْفَى بِهِ- (رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ)

অর্থ : “হযরত আস্মা বিন্তে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন একখানা জুব্বায়ে তায়ালিছা বের করে বললেন- নবী করিম (দঃ) এই জুব্বা মোবারক পরিধান করতেন। আমরা এই জুব্বা মোবারক খানা ধৌত করে উক্ত পানি রোগীকে পান করতে দেই। রোগী উক্ত জামার বরকতে আরোগ্য লাভ করে থাকে”। (বোখারী শরীফ)-অনুবাদক

এতেও প্রমানিত হলো যে, হজুর (দঃ)-এর জামা মোবারকের ধৌত পানি রোগীদের জন্য শেফার কাজ করে।

৪। ইমাম বোখারী (রহঃ) ইনতিকাল করার পর তাঁর পবিত্র মাযার হতে ছয়মাস পর্যন্ত খুশবু বের হতো। লোকেরা দলে দলে উক্ত মাযারের মাটি সংগ্রহ করে রোগীদের জন্য ব্যবহার করে উপকার পেতো। অনুরূপ ভাবে খাজা গরীবে নাওয়াজ (রাঃ)-এর মাযারের যে কোন তাবাররুক এখনও অসংখ্য রোগীকে রোগমুক্ত করে। -অনুবাদক

৫। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ (অনুবাদ) “সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) নিজ টুপিতে নবী করিম (দঃ)-এর কিছু চুল মোবারক বরকতের জন্য ধারণ করতেন। কোন এক যুদ্ধে তাঁর টুপি মাথা হতে পড়ে যায়। তিনি শক্ত হাতে তা ধরে রাখেন। এতে যুদ্ধের ক্ষতি হচ্ছিল। এ নিয়ে কতক সাহাবীর সাথে তাঁর তর্কও হয়। এমনকি- এর কারণে শত্রুর হাতে অধিক সংখ্যক মুসলমান সৈন্য শহীদ হয়ে যাচ্ছেন বলেও কতক সাহাবী তাঁকে দোষারূপ করতে থাকেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বললেন-আমি শুধু টুপির কারণে এরূপ করছি না-বরং এ কারণে করছি যে, এই টুপির ভিতরে নবী করিম (দঃ)-এর কিছু চুল মোবারক বরকতের জন্য রেখেছি। আর উক্ত টুপি খানা যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে এবং আমি যাতে ঐ চুলের বরকত লাভ হতে বঞ্চিত না হই-সেজন্যই টুপি খানা শক্ত হাতে ধরে রেখেছি”।

৬। (অনুবাদ) “মুসনাদে ইমাম আহমদ হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেনঃ ইনতিকালের পর যখন নবী করিম (দঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) গোসল করাচ্ছিলেন-তখন হজুরের চোখের পাতায় কিছু হলদে রংয়ের পানি জমে গিয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) ঐ পানিটুকু বরকতের জন্য পান করে ফেললেন”।

চতুর্থ অধ্যায়

কবর ও মাযার যিয়ারত প্রসঙ্গে

(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

প্রশ্ন : আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগনের রওযা মোবারক, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার শরীফ এবং সাধারণ কবর সমূহ যিয়ারত করা জায়েয কিনা?

উত্তর : রওযা মোবারক, মাযার শরীফ ও কবর যিয়ারত করা সুন্নাত ও কুরবাত (নৈকট্য লাভ)। অনুরূপ ভাবে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও সুন্নাত। কুরআন ও সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানের পৃথক কবরস্থানের অভাবে এবং ওহী প্রাপ্তির পূর্বে যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। ওহী প্রাপ্তি ও পৃথক কবরস্থানের ব্যবস্থার পর যিয়ারত করার পূর্ব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নবী করিম (দঃ) যিয়ারত করার অনুমোদন ও নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করেন। কাজেই যিয়ারত করা নবীজীর সুন্নাত।

প্রশ্ন : যিয়ারত করা বৈধ ও সুন্নাত হওয়ার দলীল প্রমাণ কি কি?

উত্তর : ১। মুসলিম শরীফে আছেঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُّوْهَا

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আমি প্রথম দিকে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো” (মুসলিম শরীফ)

২। বায়হাকী শরীফে আছে

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُرْقِي الْقُلُوبَ وَتُذَمِّعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন : আমি তোমাদেরকে প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যিয়ারত করো। কেননা, কবর যিয়ারত কলবকে নরম করে, চোখে অশ্রু ঝরায় এবং পরকালকে স্মরণ করায়” (বায়হাকী)

৩। মুসলিম শরীফে আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِقُومُ مُؤْمِنِينَ وَاتَّكُمُ مَا تَوَعَدُونَ غَدًا مُؤْجِلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَاهِلِ بَقِيعِ الْغُرَقَدِ (رواه مُسْلِمٌ)

অর্থ : “হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন- নবী করিম (দঃ) শেষরাত্রে মদিনা শরীফের বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী) নামক কবরস্থানে গমন করে যিয়ারত করতেন। তিনি ইনতিকাল প্রাপ্ত সাহাবীগনকে এভাবে সালাম দিতেন এবং দোয়া করতেনঃ “হে পরকালের মুমিন বাসিন্দাগন। তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা আগামীতে পেয়ে যাবে। তোমরা আমাদের আগে গমন করেছে। আমরাও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! বাকীউল গারকাদ কবরস্থানের বাসিন্দাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও”। (মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে মদিনা শরীফের মুসলিম গোরস্থান বাকীউল গারকাদ- যা পরবর্তীতে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক জান্নাতুল বাকী নামে নামকরণ করা হয়েছে- তা তিনি নিজে যিয়ারত করেছেন। উক্ত কবরস্থান সাহাবীগনের কবরস্থান। নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের পর মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকী ও মক্কা শরীফের জান্নাতুল মোয়াদ্লা নবীগনের রওজা মোবারক ব্যতিত পৃথিবীর অন্যান্য কবরস্থান থেকে উত্তম। কেননা, উক্ত দুই কবরস্থানে হাজার হাজার সাহাবার মাযার শরীফ অবস্থিত। নবী করিম (দঃ) জান্নাতুল বাকী নিজে যিয়ারত করেছেন। কাজেই কবর যিয়ারত করা হজুর (রঃ)-এর কর্মের দ্বারা

সুন্নাত প্রমানিত হলো। মক্কী জিন্দেগীতে ১৩ বৎসরে অনেক সাহাবী ও সাহাবীয়া ইনতিকাল করেছিলেন। সে সময় জানাযা ও কবর যিয়ারতের আসমানী নির্দেশ নাজিল হয়নি- বলে তিনি বিনা জানাযায় সাহাবীগনকে- এমন কি বিবি খাদিজা (রাঃ) কেও দাফন করেছেন। যিয়ারত করার বিধান তখনও নাজিল হয়নি। কেননা, উক্ত কবরস্থানে কাফের মুশরিককেও মাটি দেয়া হতো। তদুপরি- ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল- যাতে শিরক ও জাহেলিয়াতের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়। হাদীসে ইহাকে “করীবুল আহ্দের ইলাল জাহেলিয়াত” বলা হয়েছে। অর্থাৎ জাহেলিয়াত যুগের কাছাকাছি সময়। যখন তিনি মদিনা শরীফে গমন করলেন এবং জানাযার হুকুম নাজিল হলো, মুসলমানদের পৃথক কবরস্থানও হয়ে গেল- তখন কবর যিয়ারতেরও অনুমতি দেয়া হলো - যা আগে সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আরও উল্লেখ্য যে, নবী করিম (দঃ) পৃথিবীতে তিনটি স্থানকে জাম্মাত ও জাম্মাতের বাগিচা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যথা- জাম্মাতুল বাকী, জাম্মাতুল মোয়াল্লা ও রওয়াতুম মিন রিয়াযিল জাম্মাত। প্রথম দুইটি স্থান হলো জাম্মাত, আর নবীজীর রওয়া মোবারক থেকে মিস্বার শরীফ পর্যন্ত স্থানটি হলো জাম্মাতের বাগান। -অনুবাদক

প্রশ্ন : মেয়ে লোকদের কবর যিয়ারতের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি ?

উত্তরঃ শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ইমামগনের মতে পুরুষ লোকের জন্য কবর যিয়ারত করা বিনা শর্তে সুন্নাত এবং মেয়ে লোকদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে যায়েয ও সুন্নাত। আশ্বিয়ায়ে কেরামের রওয়া মোবারক সমূহ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার সমূহ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা নারী পুরুষ-সবার জন্যই সুন্নাত। তবে কিছু শর্ত আছে। যেমনঃ পর্দা সহকারে গমন করা, মুহ্রিম পুরুষ সাথে নেয়া, পুরুষ লোকের সাথে মিলে মিশে যিয়ারত না করা, চিৎকার করে বুক ফাটা আত্ননাদ না করা (নিয়াহাত)- ইত্যাদি। কোন কোন উলামা বলেছেন- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই যিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা- নবী করিম (দঃ) যেই হাদীসে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন- সেখানে নারী পুরুষ সকলকেই অনুমতি দিয়েছেন। মেয়ে লোকদের নীরব কান্নাকাটা করার ব্যাপারটি নিষিদ্ধ নয়। তবে ধৈর্য ধারণ করার তাকিদ রয়েছে। যেমনঃ

১। বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً بِمَقْبَرَةٍ تَبْكِي عَلَى قَبْرِ ابْنِهَا فَأَمَرَهَا بِالصَّبْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) জনৈক মহিলা সাহাবীয়াকে কোন এক কবরস্থানে তাঁর ছেলের কবরের পাশে কান্নারত অবস্থায় দেখে তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন- কিন্তু যিয়ারত করতে নিষেধ করেন নি” (বুখারী ও মুসলিম)। বুঝা গেল- ধৈর্য ধারণের শর্তে মহিলাদের যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে।

২। মুসলিম শরীফে অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ سَيِّدَتَنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الدُّعَاءَ لَزِيَارَةِ الْقُبُورِ لَمَّا قَالَتْ لَهُ كَيْفَ أَقُولَ لَهُمْ- فَقَالَ : قُولِي السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ مِنَّا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ)- এর খেদমতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) আরজ করেছিলেন- আমি কবর সমূহ যিয়ারত কালে কিভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করবো এবং কিভাবে কবর যিয়ারত করবো? তখন নবী করিম (দঃ) বললেন- এভাবে সম্বোধন করবে ও দোয়া করবেঃ হে কবরবাসী মুসলিম নরনারীগন, তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পূর্বে গমনকারী ও পরে গমনকারী মরহুম নর-নারীগনকে আল্লাহ্ রহম করুন। ইনশা আল্লাহ, আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো”। (মুসলিম শরীফ)

এখানে প্রমানিত হলো- নবী করিম (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সাধারণ মুসলমানের

কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন। তবে শরীয়তের ইমামগণ সমস্ত হাদীস পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নারীদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন- ঐ সব শর্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতীক এবং যুক্তিযুক্ত। পর্দা পালন করা, মুহরিম পুরুষের সাথে গমন করা ও বেগানা পুরুষদের সাথে মেলামেলা না করা- ইত্যাদি শরীয়তেরই পৃথক স্থায়ী বিধান। সুতরাং-এই স্থায়ী বিধানকে কোন রকমেই ভঙ্গ করা যাবেনা। মাযায়ে হোক কিংবা বাজারে হোক- সর্বাবস্থায়ই পর্দা ফরয।

প্রশ্নঃ “যিয়ারত কারিনী নারীদের উপর আল্লাহ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেছেন” -এই হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে- নারীদের জন্য যিয়ারতে গমন করা নিষিদ্ধ। এই হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

উত্তরঃ হাদীস শরীফে এসেছেঃ

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

অর্থঃ “অধিক যিয়ারত কারিনীর উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত”।

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- যেহেতু অন্য হাদীস দ্বারা নারীদের যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সুতরাং লানতের হাদীস খানা নিষেধ মূলক নয় বরং সতর্ক মূলক। অর্থাৎ ঐ সব নারীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত- যেসব যিয়ারত কারিনী ঘন ঘন যিয়ারত করে। সেজন্যই নবী করিম (দঃ) زَوَارَاتِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন- যা দ্বারা মুবালাগা বা ঘন ঘন যিয়ারত করা বুঝায়। অর্থাৎ ঘনঘন যিয়ারত কারিনীর উপর লা'নত। সংযত যিয়ারত কারিনীদের জন্য এই অভিশাপ নয়। উক্ত হাদীসের আর একটি ব্যাখ্যা উলামাগণ এভাবে দিয়েছেন- ‘এ হাদীসখানা ঐ সব নারীদের বেলায় প্রযোজ্য- যারা যিয়ারত কালীন সময়ে কান্না কাটা করে ও বুক ফাটা চীৎকার করে’। যেমন- অধিকাংশ মেয়ে লোকেরই এ বদ অভ্যাস আছে। সুতরাং এরূপ যিয়ারতে গমন নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু যদি নারীগণ এ বদ অভ্যাস মুক্ত হতে পারেন, যেমন- শুধু দিল নরম করা, পরকালের স্মরণকে তাজা করা ও বরকত লাভ করা- ইত্যাদি নিয়তে গমন করেন- কান্না কাটা না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে নারীদের যিয়ারতও জায়েয এবং সুন্নাত। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত অনুমতিমূলক হাদীস একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যবহারিক দলীল : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নিজ ভাই আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফ হতে প্রতি বৎসর মক্কা শরীফ গমন করতেন। হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে মদিনা শরীফের বাহিরে উহুদের ময়দানে গমন করে হযরত আমির হামযা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন। ইমাম দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইন্তিকাল করলে তাঁর বিবি তাঁর মাযার পাকা করে তথায় এক বৎসর বসবাস করেছেন। নবীবংশের নারীগণের আমল অন্যান্য নারীদের জন্য আদর্শ। বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়ে আমার লিখিত আহ্কামুল মাযার বা যিয়ারতের বিধান পাঠ করুন। তাতে মাযার সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান পাবেন। -অনুবাদক

প্রশ্ন : যিয়ারত বিরোধী আলেমরা বলে- হাদীসে নাকি মাযার যিয়ারতে সফর করাকে হারাম বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত হাদীস খানা পেশ করে। যথাঃ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-তিন মসজিদ ছাড়া সফর করোনা। উক্ত তিন মসজিদ হলো- মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্কা ও আমার এই মসজিদ”। (বোখারী)

প্রশ্ন : উক্ত হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? জানতে চাই।

উত্তর : উপরোক্ত হাদীস খানা মসজিদের সফর প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম গাজজালী (রহঃ) সহ অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞ উলামাগণ হাদীস খানার এরূপ ব্যাখ্যা করেছেনঃ বেশী ফজিলতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা (মাল-সামানা ও হাড়ি পাতিল সহ) যাবেনা। উক্ত তিনটি মসজিদ হলো- মক্কা মোয়াজ্জমার মসজিদে হারাম, বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে আক্কা এবং আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)। - বোখারী শরীফ।

ব্যাখ্যা : হাদীস শরীফ খানা মসজিদ সংক্রান্ত। কোন্ মসজিদের জন্য সফর করা যাবে এবং কোন্ মসজিদের জন্য সফর করা যাবে না -সে সম্পর্কেই নবী করিম (দঃ) উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়তে ও বেশী সওয়াবের

আশায় সফর করা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা, তিন মসজিদের ফজিলত আলাদা। মসজিদে হারামের সাওয়াব লক্ষ গুন, আর মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার গুন সাওয়াব বেশী। এছাড়া অন্যান্য জামে মসজিদ সাওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। মাযারের সাথে এই হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামের জামে মসজিদ আর ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ সাওয়াবের ক্ষেত্রে এক বরাবর। সুতরাং বেশী সাওয়াব ও ফজিলতের নিয়তে দূর থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদে বা দিল্লীর মসজিদে সফর করা হারাম। কেননা, এতে অনুমান করে সাওয়াব নির্ধারন করা হয়- নবীজীর হাদীস মোতাবেক নহে। কেয়াছ করে মনগড়া সাওয়াব নির্ধারন করা হারাম। তদুপরি, দূরের মসজিদে অধিক সাওয়াবের আশায় কষ্ট করে যাওয়া অনর্থক ও অন্যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হলো- মাযারের যিয়ারতের সাথে এই হাদীসের কোনই সম্পর্ক নেই। এক জায়গার হাদীস অন্য জায়গায় ব্যবহার করাই বরং হারাম। বিরোধীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিন মসজিদ ছাড়া অন্য সফর হারাম হলে- আরাফাত, মীনা, মোজদালেফা, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করা অথবা ইলম অর্জন করা ও ব্যবসা বানিজ্যের উদ্দেশ্যে দূরদেশে সফর করাও হারাম হয়ে যাবে। এমন কথা কোন মুসলমানই বলতে পারেনা। সুতরাং মাযার বিরোধীদের ব্যাখ্যা ভুল। হাদীস খানা মসজিদ সংক্রান্ত- মাযার সংক্রান্ত নয়। বরং উক্ত হাদীস দ্বারা ছয় উছুলী তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে সফর করাই হারাম প্রমাণিত হয়। -অনুবাদক

পঞ্চম অধ্যায়

মৃতদের শ্রবন প্রসঙ্গে

(سَمَاعُ الْمَوْتَى)

প্রশ্ন : আচ্ছা! মৃত ব্যক্তিগন কি জীবিত ব্যক্তিগনের দোয়া দরুদ শুনতে পান? এবং যিয়ারত কারীকে চিনতে পারেন?

উত্তর : অবশ্যই চিনতে পারেন এবং তাদের কথা বার্তা ও দোয়া দরুদও শুনতে পান। এ কারনেই নবী করিম (দঃ) হাদীসে বলেছেন- প্রথমে কবরবাসীগনকে সম্বোধন করে সালাম করতে হবে। পরে দোয়া দরুদ পড়তে হবে। হযরত রাসুল করিম (দঃ) নিজেই মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকীতে গমন করে প্রথমে ইনতিকাল প্রাপ্ত সাহাবাগনকে সম্বোধন করে সালাম দিতেন- পরে দোয়া করতেন। তাঁদের সাথে কথা বার্তা ও বলতেন। যদি তাঁরা না শুনতেন বা না বুঝতেন- তাহলে নবী করিম (দঃ) কি তাঁদের সাথে ঐরূপ আচরন করতেন? কখনই নয়। কথা শুনে না এবং বুঝে না- এমন লোকদের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কথা বলার চিন্তা করাই বরং বেদ্বীনী ও কুফরী।

প্রশ্ন : আচ্ছা! কবরবাসীগন যে শুনতে পান-তার দলীল কি?

উত্তরঃ ১। প্রথম দলীল : ইমাম ইবনে আবিদু দুনিয়া কিতাবুল কুবুর গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন : -

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ رَجُلٌ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ-

অর্থ : “হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন - নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

যে কোন ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে তার কবরের পাশে বসলে কবরবাসী শান্তি লাভ করে তৃপ্ত হয় এবং তার সালামের জওয়াব দেয়- যে পর্যন্ত না যিয়ারতকারী সেখান থেকে প্রস্থান করে”। (কিতাবুল কুবুর)

এতেই প্রমানিত হলো- প্রত্যেক কবরবাসীই সালাম শুনে ও তার জবাব দেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যিয়ারতকারী সেখানে অবস্থান করেন- কবরবাসী তাদের সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করে তৃপ্ত হন।

২। দ্বিতীয় দলীলঃ

কিতাবুল কুবুর গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন :

عن أبي هريرة قال إذا مر الرجل بقبر أخيه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام-

অর্থ : “হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেন : যখন কোন মুসলমান আপন পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে- তখন কবরবাসী তার সালামের জওয়াব দেয় এবং তাকে চিনতে পারে। আর অপরিচিত লোকেরা যিয়ারত করে সালাম দিলে শুধু সালামের জওয়াব দেয়”।

এতেও প্রমানিত হলো- যে, কবরবাসী সালাম শুনে ও জওয়াব দেন। যিয়ারতকারী পরিচিত হলে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনে। সুব্হানাল্লাহ। সাধারণ কবরবাসীর যদি এ অবস্থা হয়- তাহলে অলীগনের অবস্থা কি হবে!

প্রশ্ন : আচ্ছা ! যিয়ারত বিরোধী লোকেরা প্রায়ই কোরআন মজিদের একটি আয়াত দিয়ে প্রমান করতে চায় যে, মৃত কবরবাসীরা শুনে না।

আয়াত খানা এই :

وما انت بمسمع من في القبور

“হে রাসুল আপনি কবরবাসীগণকে শুনাতে পারবেন না”। এতে বুঝা যায় যে, কবরবাসীগণ শুনে না। এর জবাবও সঠিক ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : বিরোধীদের পূর্বতন নেতা এবং ইবনে তাইমিয়া সাগরিদ ইবনে কাইয়েম কিতাবুর রুহ নামক গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

أن سياق الآية يدل على أن المراد أن الكافر الميت القلب لا تقدر على سماعه اسماعاً ينتفع به كما أن من في القبور لا تقدر على سماعهم اسماعاً ينتفعون به - ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئاً البتة كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلام الرسول وخطابه وشرع السلام عليهم أي الأموات بصيغة الخطاب الذي يسمع وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام - وهذه الآية نظير قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين-

অর্থ : “উক্ত আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতায় একথাই বুঝা যায় যে- উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ হলো- “হে রাসুল, আপনি মৃত কলবের অধিকারী কাফেরদেরকে হেদায়াতের বানী কখনো শুনাতে পারবেন না- যদ্বারা তারা হেদায়াত পেতে পারে- যেমন শুনাতে পারেন না মৃত কবরবাসীকে- যদ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে”। আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত আয়াতে একথা তো বলেননি- যে, মৃত ব্যক্তির মোটেই কোন কথা শুনে পায় না।

বরং বলেছেন- আপনি কবরবাসীকে হেদায়াতের বানী শুনাতে যেমন তারা উপকৃত হতে পারেনা- তদ্রূপ মৃত কলবের কাফেরগণকেও হেদায়াতের বানী শুনাতে পারবেন না। তারা

আপনার হেদায়াতের বানী দ্বারা উপকৃত হবেনা। এখানে কেবল হেদায়াতের উপমা দেয়া হয়েছে। কানে শ্রবন করার কোন নিষেধ বানী এখানে নেই। কেননা, মৃত মুসলমান তো দূরের কথা-মৃত কাফেরগনও যে শুনতে পায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়- বদরের যুদ্ধে নিহত ৭০ জন কোরাইশ সর্দারের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কথা বার্তার মাধ্যমে। নবী করিম (দঃ) বদরের একটি গর্তে নিষ্কিণ্ড ৭০ জন কাফের সর্দারকে সম্বোধন করে তিরস্কার মূলক কথাবার্তা বলেছিলেন এবং কাফেররা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেনঃ ইয়া রাসুল্লাহ! আপনি এমন মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছেন- যারা শুনতে পায়না। তখন নবী করিম (দঃ) বলেছিলেনঃ

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ-

“হে ওমর! তোমরা তাদের চেয়ে আমার কথা বেশী শুনতে পাওনা”।

এতে বুঝা যায়- মৃত কাফেরদের শ্রবন শক্তি জীবিত লোকদের চেয়ে বেশী। তাহলে মৃত মুসলমানের শ্রবন শক্তি কতটুকু হতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। আসলে আয়াতের মধ্যে কানের নয় বরং অন্তরের শ্রবন শক্তির কথাই বলা হয়েছে- যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। নবী করিম (দঃ) হাদীস শরীফে আরও এরশাদ করেছেনঃ মৃত ব্যক্তির দাফনকারী ব্যক্তিদের বিদায় কালীন সময়ে তাদের পায়ের জুতার শব্দও শুনতে পান। তিনি মৃত ব্যক্তিদেরকে প্রথমে সালাম দিতেন সম্বোধন মূলক বাক্য দ্বারা- যা তারা শুনতে পায়। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ যারা আপন মৃত মুসলমান ভাইদেরকে সালাম দিবে, তারা উক্ত সালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন।

বিরোধী দলের উপস্থাপিত অত্র আয়াত খানা আল্লাহ্ তায়ালা অন্য একটি আয়াতের মত- যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- “হে রাসুল! আপনি মৃত ব্যক্তিদেরকে হেদায়াতের বানী শুনালে যেমন তারা উপকৃত হতে পারেনা- তদ্রূপ বধির ব্যক্তিও (কাফের) যখন হেদায়াতের বানী শুণে পিছটান দিয়ে ফিরে যায়, তাদেরকেও আপনি হেদায়াতের বানী শুনতে পারবেন না” (ইবনে কাইয়েমের ব্যাখ্যা শেষ)।

এই আয়াতে এবং বিরোধীদের উপস্থাপিত আয়াতে কানে শ্রবনের নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন ইঙ্গিত নেই- বরং কলবের শ্রবনের কথাই বিধৃত হয়েছে উক্ত দু’টি আয়াতে। সুতরাং বিরোধীদের ব্যাখ্যাটি ভুল ও ভ্রান্ত এবং প্রতারনা মূলক। বরং মৃত ব্যক্তির দৃষ্টে ও চিনে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কবরস্থানে কোরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে।

(التَّلَاوَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ)

প্রশ্নঃ কবরের পার্শ্বে কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব কবরবাসীর রুহে পৌঁছিয়ে দেয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তরঃ মুসলমানগনের যে কোন নফল ইবাদতের সাওয়াব মৃত এবং জীবিত ব্যক্তির নামে হাদিয়া করা ও সাওয়াব পৌঁছান শরীয়ত সম্মত ও সঠিক বিধান। যেমন- কোরআন মজিদ তিলাওয়াতের সাওয়াব ও অন্যান্য তাস্বীহ তাহলীলের সাওয়াব উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতানুযায়ী নিয়ত অনুসারে মৃত ব্যক্তি ও জীবিত ব্যক্তিগনের নিকট পৌঁছে। কেননা, তিলাওয়াত কারীগন তিলাওয়াত শেষে নিম্নোক্ত ভাবে দোয়া করেনঃ “হে আল্লাহ! আমরা যা কিছু তিলাওয়াত করেছি বা তাহলীল পাঠ করেছি- তার সাওয়াব তুমি অমুকের রুহে পৌঁছিয়ে দাও”। ইমামদের মধ্যে এখতেলাফ শুধু এক্ষেত্রে যে- যদি দোয়া না করে এবং না পৌঁছায়- তবে নিজে নিজে সরাসরি উক্ত সাওয়াব পৌঁছবে কিনা? শাফেয়ী মযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী না পৌঁছালে পৌঁছবেনা। কিন্তু পরবর্তী শাফেয়ী ইমামগন এবং অন্য তিন মযহাবের ইমামগনের ঐক্যমতে শুধু মনে মনে নিয়ত করে তিলাওয়াত করলেই উক্ত তিলাওয়াত ও যিকিরের সাওয়াব পৌঁছবে। পৃথক ভাবে পৌঁছানোর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে দোয়া মুনাজাত করা ভাল। এমতের উপরই মুসলমানগনের আমল চলে আসছে। হাদীস শরীফে এসেছেঃ

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ-

অর্থঃ “মুসলমানগন সত্যস্কৃত ভাবে যে কাজকে ভাল মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও ভাল। (কেননা কোরআন মজিদে উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর সাক্ষী বলা হয়েছে- বাক্বারা)

হুজ্জাতুল ইসলাম কুতুবুল ইরশাদ ইমাম সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে আলভী হাদ্দাদ (রহঃ) বলেছেনঃ

وَمِنْ أَعْظَمَ مَا يَهْدِي إِلَى الْمَوْتِ بِرُكَّتِهِ وَكَثْرَةِ نَفْعِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاهْدَاءِ ثَوَابِهِ إِلَيْهِمْ وَقَدْ أَطْبَقَ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَقَالَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ سَلَفًا وَخَلَفًا (مَقَالَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ سَبِيلِ الْأَنْكَارِ)

অর্থ : “হযরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ আলভী হাদ্দাদ (রহঃ) নিজ গ্রন্থ ছাবিলুল আজকার-এ লিখেছেনঃ মৃত ব্যক্তিগণের জন্য যা কিছু হাদিয়া পেশ করা হয় এবং যা কিছু বেশী উপকারী, তা হচ্ছে- তিলাওয়াতে কোরআন এবং তার সাওয়াব কবরবাসীগণের রূহে ইসালে সওয়াব করা। এ পন্থায় সাওয়াব পৌছানোর রীতি নীতি প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশেই মুসলমানগণের মধ্যে চালু রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগের মশহুর উলামা ও বুয়ুর্গানে দ্বীন এ মতই পোষন করেন- (ছাবিলুল আজকার)।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা যে জায়েয- তার প্রমান কি?

উত্তরঃ

১। প্রথম দলীল : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা শরীফে আছেঃ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اقْرَؤْ عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يُسْ-

অর্থ : “হযরত মা’ ক্বাল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) হতে বর্ণিত- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাছে সুরা ইয়াছীন তিলাওয়াত করো।”

হাদীস বিশারদ উলামাগন এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- হাদীসখানা ব্যাপক। ইন্তিকালের সময়ে এবং ইন্তিকালের পরে, ঘরে ও কবরে- সর্বত্রই তিলাওয়াত করা যাবে। কেননা, হাদীসে ‘মৃত ব্যক্তির কাছে’ বলা হয়েছে। কাছে- অর্থ মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর।

২। দ্বিতীয় দলীল

তাবরানী ও ইমাম বায়হাকীর শুয়াবুল ইমান হাদীস গ্রন্থে আছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَاسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ- ذَكَرَهُ الْأَمَامُ الشَّيْطُوطِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ-

অর্থ : “হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মারফু হাদীসের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ ইন্তিকাল করে, তাকে ফেলে রেখোনা বরং যথাশীঘ্র কবরস্থ করো। তার মাথার দিকে সুরা বাক্বারার প্রথম তিনটি আয়াত এবং পায়ে দিকে উক্ত সুরার শেষ তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করো।” ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) তাঁর জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩। তৃতীয় দলীল আমলী :

ইবনে তাইমিয়ার শাগরিদ ইবনে কাইয়েম তার কিতাবুর রূহ - গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কবরের পার্শ্বে কোরআন শিক্ষা দেয়া সুন্নাত। এর প্রমান হলো- সল্ফে সালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাব্য়ে তাবেয়ীন) গণের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুয়ুর্গ তাঁদের কবরের পার্শ্বে সব সময় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য অস্থিরত করে গেছেন। তন্মধ্যে হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অছিযত করে গেছেন- যেন তাঁর মাষারের পার্শে সব সময় সুরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়।

মদিনা শরীফের আনসারগনের (রাঃ) মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, কেউ ইন্তিকাল করলে লোকেরা দল বেঁধে পালা করে তাঁর কবরে ও মাযারে গমন করতেন এবং তথায় কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। (ইবনে কাইয়েমের বর্ণনা শেষ) বর্তমানে বিভিন্ন মাযারে এই প্রথাই চালু রয়েছে- অনুবাদক।

উলামাগন বর্ণনা করেছেন যে, কোন লোক নেক আমল করে তার সাওয়াব অন্যকে দান করতে পারে- চাই নামায হোক অথবা তিলাওয়াত অথবা অন্য যে কোন নেক আমল। এই দাবীর পেছনে দলীল হচ্ছে একখানা হাদীস -যা ইমাম দারু কুত্নী বর্ণনা করেছেন। যথাঃ

৪। চতুর্থ দলীল :

ان رجلا قال يا رسول الله انه كان لى ابوان ابرهما فى حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان من البر ان تصلى لهما مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك- رواه الدار قطنى

অর্থ : “একজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ- আমার পিতা মাতা জীবিত আছেন। জীবিতাবস্থায় আমি তাঁদের খেদমত করতে পারি এবং নেকী অর্জন করতে পারি। তাঁদের ইন্তিকালের পর আমি কিভাবে তাঁদের খেদমত করে নেকী অর্জন করতে পারবো? তদুত্তরে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন- তোমার নামাজের সাথে তাদের জন্যও কিছু নামাজ আদায় করো এবং তোমার রোজার সাথে তাদের জন্যও কিছু রোজা রেখো। (দারু কুত্নী)।

উল্লেখ্য, তৃতীয় দলীলটি পেশ করেছে ইবনে কাইয়েম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর অছিযত এবং আনসার গনের আমল- এই দুইটি দলীল আমলী বা ব্যবহারিক। পালাক্রমে

মাযারে গমন করা এবং কবরের পার্শে কোরআন মজিদ শিক্ষা দেয়া- উভয়টিই সাহাবা ও আনসারগনের আমল দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং কবরের পার্শে ৪০ দিন কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করার প্রথা নূতন কিছু বা বেদয়াত নয় - বরং সুন্নাত। ৪র্থ দলীলে পিতা মাতার জন্য নফল নামাজ ও নফল রোজার কথা তো স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ই নির্দেশ করেছেন। অতএব বিরোধীদের আপত্তি তো হাদীসের বিরুদ্ধেই আপত্তি। আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই। - অনুবাদক

প্রশ্নঃ কোন কোন আলেম বলেন- একজনের আমল অন্যের উপকারে আসেনা। কোরআন ও হাদীসে নাকি এর প্রমান আছে। তারা কোরআন মজিদের আয়াত “লাইছা লিল ইন্হানে ইল্লা মা ছা’আ” (সুরা নাজম) এবং হাদীস শরীফ ‘ইয়া মাতাল ইন্হানু ইন্কাতাআ আনহু আমালুহু’ এ প্রসঙ্গে পেশ করে থাকে। তারা আয়াতের অর্থ করে এভাবে- মানুষ তাই পায়- যা সে নিজে করে (সউদি কুরআনুল করিম)।

তারা হাদীস শরীফের অনুবাদ করে এভাবে- মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় সুতরাং অন্যের কোন আমলে কাজ হবেনা। এখন জিজ্ঞাস্য এই- তাদের এই অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক কিনা? যদি না হয়- তাহলে সঠিক ব্যাখ্যা কি ?

উত্তরঃ ইহালাে সাওয়াব বিরোধী আলেমগন কুরআন ও হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে- তা সঠিক নয়। তারা কোরআন ও হাদীসের অপব্যখ্যা করেছে। তাদেরই পূর্বতন নেতা ইবনে কাইয়েম যে ব্যাখ্যা দিয়েছে- তাতেই তাদের মুখোশ খুলে যাবে। ইবনে কাইয়েম তার কিতাবুর রুহ এস্থে সঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছে তিন প্রকারে।

قال ابن القيم فى كتاب الروح : ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسقى غيره وإنما أخبر أنه لا يملك الأسعية وأما سقى غيره فهو ملك لساعية فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن

يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ سَبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا
بِمَا سَعَى - (كِتَابُ الرُّوحِ لِابْنِ الْقَيِّمِ)

প্রথম ব্যাখ্যা :

অর্থ : “ইবনে কাইয়েম **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى**-এর ব্যাখ্যা কিতাবুর রুহ নামক গ্রন্থে এভাবে করেছে “কোরআনের উক্ত আয়াতে অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবেনা”- এমন কথা কুরআনে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত সাওয়াবের মালিক সে নিজেই হবে- অন্য লোক নয়। অন্যের অর্জিত আমলের মালিকও ঐ ব্যক্তি নিজেই। কিন্তু যদি অন্য মালিক ইচ্ছা করে এই ব্যক্তির জন্য কিছু দান করে, তবে করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে দান না করে নিজের জন্যই রেখে দিতে পারে। আল্লাহু তায়ালা উক্ত আয়াতে তো একথা বলেন নি যে, মানুষ নিজের কর্মফল ছাড়া অন্যের দানকৃত আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না”। (কিতাবুর রুহ)।

নোটঃ উক্ত ব্যাখ্যায় ইবনে কাইয়েম একটি হরফের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ হরফটি হলো **لِلْإِنْسَانِ** শব্দটির প্রথম হরফ **لَام** লাম।

উক্ত **لَام** আরবী ব্যাকরণে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) **إِنْتَفَاعٌ** বা উপকারার্থে, (২) **تَمْلِكُكَ** বা মালিক হওয়া অর্থে। বিরোধীরা হরফটির প্রথম অর্থ গ্রহন করে ভুল ব্যাখ্যা করেছে। আয়াতের মধ্যে লাম (**لَام**) হরফটি ইবনে কাইয়েমের মতে উপরোক্ত মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হবে। তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবেনা। এখন আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে এই- “মানুষ নিজে যা আমল করে, তার মালিক সে নিজেই। অন্য কোন লোক তা কেড়ে নিতে পারবেনা। যে পর্যন্ত সে অন্যকে দান না করবে, সে পর্যন্ত অন্য লোক এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেনা। এমনকি উহার মালিকও হতে পারবে না”।

কিন্তু ইচ্ছা হলে ছাওয়াবের মাধ্যমে নিজেদের কৃত আমলের ছাওয়াব অন্যের রুহে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সে তখন সাওয়াবের মালিক হয়ে যায়। বিরোধীদের ব্যাখ্যা গ্রহন করলে- অন্যের দান করা আমলে উপকৃত হওয়া যাবেনা- বলে সাব্যস্ত হয়। অথচ

কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, নিজে আমল করে সে আমলের সাওয়াব অন্যকে দান করা যায়। যেমন- পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তরেই পিতা মাতার প্রতি সন্তানের নামাজ রোজা ইত্যাদি বখ্শিশ করার কথা হাদীসে এসেছে।

আর বিরোধীদের উপস্থাপিত (ইয়া মাতা) হাদীস খানাও তাদের মতের স্বপক্ষে নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে নবী করিম (দঃ) শুধু এতটুকুই বলেছেন যে- মৃত্যুর সাথে সাথে তার নিজের আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার ফলাফলও বন্ধ হয়ে যাবে- এমন কথার ইঙ্গিত উক্ত হাদীসে নেই। তদুপরি- অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার নিষেধাজ্ঞাও উক্ত হাদীসে নেই। বিরোধী দলেরা কোথায় পেল যে, অন্যের আমলের দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবেনা? অন্যের আমলের মালিক হবে সে লোক নিজে। কিন্তু যদি সে নিজের আমল অন্যকে দান করে - তাহলে অবশ্যই তা দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে। আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া এক জিনিস- আর অপরকে দান করা অন্য জিনিস। ইবনে কাইয়েমের প্রথম ব্যাখ্যা সমাপ্ত। খুব ভাল করে বুঝে নিন।-অনুবাদক

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- **لَيْسَ**-আয়াতটির হুকুম অন্য একটি আয়াত দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। সে আয়াতটি হলো :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
(سُورَةُ الطُّورِ)

অর্থ : “যারা ঈমানদার- তাদের সন্তানগণও তাদেরই অনুগামী হবে জন্মগত ঈমানের কারনে। আমি (আল্লাহ) তাদের সন্তানগণকে তাদের সাথে (জান্নাতে) একসাথ করবো” (সূরা তুর)।

উক্ত আয়াতে পিতৃপুরুষের নেক আমলের (ঈমান) কারনে সন্তানগণও বেহেস্তী হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এই আয়াত খানা **لَيْسَ**-আয়াতকে মানসুখ করে দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- একজনের আমল অন্যের উপকারে আসবেনা। আর অত্র শেযোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে-পিতৃ পুরুষের ঈমান সন্তানের উপকারে আসবে।

ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمْسَاقُ** আয়াতের মধ্যে **لَمْ** হরফটি **اِنْتِفَاعٌ** অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা মানসুখ হয়ে গেছে। বর্তমানে উক্ত আয়াতের কার্যকারিতা বা হুকুম রদ হয়ে গেছে এবং সুরা তুরের আয়াতটি তার রদকারী বা **نَاسِخٌ** হয়ে অন্যের আমলের দ্বারা উপকার পাওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা :

তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) সুরা নাজমের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

أَنَّ ذَلِكَ لِقَوْمٍ مُّوسَىٰ وَابْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا يَسْعَىٰ لَهُمْ غَيْرُهُمْ-

অর্থ : “হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মুছা (আঃ)-এর উম্মতের ক্ষেত্রেই উক্ত আয়াত খানার হুকুম ছিল। এই উম্মতের বেলায় নিজের আমল এবং অন্যের দান করা আমল- উভয়ই ফলদায়ক হবে বলে সুরা তুরে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক উম্মতের হুকুম অন্য উম্মতের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এই উম্মতের বেলায় নিজের আমল ও অন্যের দানকৃত আমলের সাওয়াব উপকারী হবে। সুরা নাজমের আয়াত খানা (**لَيْسَ**) হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুছা (আঃ)-এর উম্মতের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য নয়।

বিঃ দ্রঃ একজনের কৃত আমল যে অন্যের উপকারে আসে- সে সম্পর্কে দুখানা হাদীস খুবই তাৎপর্য পূর্ণ।

প্রথম হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

إِنَّ امْرَأَةً دَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِيْذَا أَحْبَبْتُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ-

অর্থাৎ “এক মহিলা সাহাবীয়ার ছেলে মারা গেলে উক্ত মহিলা আরজ করলেন- ইয়া রাসুল্লাহ! আমি কি তার পক্ষে বদলা হজ্ব করতে পারবো? নবী করিম (দঃ) বললেন- হ্যাঁ,

পারবে। তোমাকেও সাওয়াব দেয়া হবে”। এখানে ছেলের হজ্বের সাওয়াব সে পেয়ে গেল।

দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে :

وَقَالَ آخِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ-

অর্থ : “দ্বিতীয় এক সাহাবী আরজ করলেন- ইয়া রাসুল্লাহ! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। আমি তাঁর জন্য সদকা করলে তিনি কি তার সাওয়াব পাবেন? হজ্বুর (দঃ) এরশাদ করলেন- হ্যাঁ, পাবে। উক্ত সাহাবী ছিলেন হযরত সা'দ (রাঃ)।

এতেই প্রমানিত হলো- একজনের আমলের সাওয়াব অন্যজন পায়।

সপ্তম অধ্যায়

কবর চুম্বন করা ও হাতে স্পর্শ করা প্রসঙ্গে

(التَّسْبِيحُ بِالْقُبُورِ وَتَقْبِيلُهَا)

প্রশ্নঃ কবর ও মাযার স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা জায়েয কিনা?

উত্তরঃ কবর ও মাযার চুম্বন করা বা স্পর্শ করা একদল উলামার মতে মাকরুহ এবং অন্য একদল ওলামার মতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মোবাহ ও জায়েয। কিন্তু কারো মতেই হারাম নয়। হারাম কেউই বলেন নি। বিষয়টি মাকরুহ হওয়া- না হওয়ার মধ্যে সীমিত।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! জায়েয হওয়ার দলীল কি?

উত্তরঃ শরীয়তের প্রণেতা (شَارِع) নবী করিম (দঃ)-এর পক্ষ হতে কবর চুম্বনের বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়না এবং নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন দলীলও পাওয়া যায়নি। বরং সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেই অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

১। নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে বিবি ফাতেমা (রাঃ) আপন চিবুক স্থাপন করেছেন। কোন সাহাবী তা নিষেধ করেন নি।

أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَضَعَتْ خَدَّيْهَا عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (أَدْلَةُ أَهْلِ

السُّنَّةِ-لِلسَّيِّدِ يُونُسَ رِفَاعِي)

অর্থঃ “হযরত ফাতেমা (রাঃ) আপন দু গভ নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে স্থাপন করেছেন। কোন সাহাবীই তা নিষেধ করেন নি” (আদিগ্নাতু আহলিচ্ছুনাহ - সৈয়দ ইউসুফ রেফারী (সংগৃহীত)।

২। হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে আপন কপাল ঘষে ছিলেনঃ

وَقَدْ رَوَى أَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا زَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَبْكِي وَيَمْرَغُ خَدَّيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَجَّهَهُ عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ (شِفَاءُ السَّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ لِلْإِمَامِ تَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ)

অর্থঃ “বর্ণিত আছেঃ হযরত বেলাল (রাঃ) যখন (সিরিয়া হতে আগমন করে) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করতে আসলেন- তখন তিনি বেখোদ হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং আপন গভ যুগল; (অন্য বর্ণনায়) আপন কপাল রওযা মোবারকে ঘষতে লাগলেন” এ ঘটনা বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেলাম প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কেউ নিষেধ করেন নি। (শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারাতি খাইরিল আনাম- ইমাম তাকিউদ্দীন সুবুকী -৭২৭ হি)

৩। খতীব ইবনে জামালা বর্ণনা করেনঃ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى قَبْرِهِ-

অর্থঃ “হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আপন ডান হাত নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের উপর স্থাপন করতেন”- (খতীব ইবনে জামালা)

৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহঃ) ফতোয়াঃ

وَتَبَّتْ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ

تَقْبِيلُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْبَرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
بِذَلِكَ-

অর্থ : “ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল - রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারক ও মিম্বার শরীফ চুম্বন করা জায়েয কিনা? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন- এতে কোনই দোষ নেই। অতএব ৪টি দলীল দ্বারা কবর-মাযার চুম্বন ও স্পর্শ করা প্রমানিত হলো

প্রশ্ন : কবর পাকা করা এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করার বিধান শরীয়েতে আছে কি?

উত্তরঃ কোন কোন আলেম বলেছেন- কবর পাকা করা মাকরুহ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন- মাকরুহ নয় এবং কবর পাকা করা হারাম বলে শরীয়েতে কোন দলীলও নেই। কবর পাকা করা, গম্বুজ তৈরী করা ও কবরের উপর বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস দ্বারা শুধু মাকরুহ তানজিহী প্রমানিত হতে পারে - কিন্তু কোন মতেই হারাম নয়। ইহাই জম্হুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত।

(বিঃদ্রঃ) আমার লিখিত- “আহকামুল মাযার”-গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

- অনুবাদক

প্রশ্ন : পৃথিবীর অনেক দেশেই কবর ও মাযার পাকা দেখা যায়। এগুলো কি লোকেরা শুধু অযথা করেছেন?

উত্তর : শুধু অযথা বা বেহুদা কাজ হিসাবে লোকেরা কবর ও মাযার পাকা করেননি অথবা শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিংবা সৌকর্যের জন্যও একাজ করেন নি- বরং এর পেছনে রয়েছে সৎ উদ্দেশ্য ও অন্যান্য উপকারিতা। যেমনঃ

ক) কবর ও মাযার হিসাবে চিহ্নিত করা - যেন লোকেরা এর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কেউ যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখেন।

খ) ভুলক্রমে লোকেরা যেন ঐ কবর বা মাযারকে উলট পালট করে ঐ স্থানকে অন্য কাজে

ব্যবহার করতে না পারে। কেননা, কবর বা মাযার ভেঙ্গে ফেলা শরীয়েতে নিষিদ্ধ। কিন্তু সউদী সরকার তাই করেছে।

গ) আত্মীয় স্বজনরা যাতে সেখানে একত্রিত হতে পারেন। কেননা, ইহা সুন্নাত।

ঘ) কবর বা মাযার পাকা করা হলে অন্য জাতি তা সহজে দখল করতে পারেনা। যেমনঃ কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ ও দরগাহ, বাবরী মসজিদ, কাশ্মীরের হযরত ওলিউর রহমানের মাযার হিন্দুরা ধংস করতে উদ্যত হলে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল।-অনুবাদক

ঙ) হাদীস শরীফে এসেছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عَلَى قَبْرِ عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ صَخْرَةً وَقَالَ أَعْلِمُ قَبْرَ أَخِي لِأُدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبِهَقِيُّ)

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ)-এর কবরের উপর একখানা বিরাট পাথর স্থাপন করে বলেনঃ আমি আমার ভাই (দুখভাই)-এর কবরকে চিহ্নিত করলাম- যাতে করে তার পাশে আমার অন্য আত্মীয় স্বজনকে দাফন করতে পারি” (আবু দাউদ ও বায়হাকী)।

এ হলো কবর পাকা করা বা চিহ্নিত করার প্রসঙ্গ। বাকী রইলো- কবরের উপর দালান কোঠা বা গম্বুজ তৈরী করার মাসআলা। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কবর কোন ওলীর হয় অথবা নেতৃস্থানীয় মুসলমানের কবর হয় অথবা কোন সৈয়দজাদার কবর হয়, তাহলে উক্ত কবর বা মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করা দালান কোঠা তৈরী করা- নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমন- হযরত আমির হামযা, হযরত আয়েশা, হযরত খাদিজা, হযরত ওসমান, ইমাম হাসান, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মাযার পাকা ছিল। ওহাবী সউদী সরকার এক

ফরমান বলে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সেগুলো ধুলিস্যাত করে দেয়। সে সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলী সহ ভারত ব্যাপী সউদী বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সউদী আরব ব্যতীত সব মুসলিম দেশেই ওলী আউলিয়াদের পাকা মাযার ও গম্বুজ সমূহ এখনও সংরক্ষিত আছে। এ ব্যাপারে আমার লিখিত “আহকামুল মাযার” গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ফতোয়া ও হাওয়ালা দেখুন। নজদী সউদী সরকারের অপকীর্তির রেকর্ড ‘তারিখে নজদ ও হেজায এবং খিলাফত রিপোর্ট - এ দেখুন।- অনুবাদক

আপত্তিঃ

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে হুজুর পুরনুর (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ-

অর্থঃ “ঐ ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক- যারা তাদের নবীগনের মাযার সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে”।

মাযার বিরোধীরা উক্ত হাদীস দ্বারা মানুষকে বুঝাচ্ছে যে, ‘মাযার যেখানে হয় সেখানেই মানুষ সিজদা করে। কাজেই মাযার ভেঙ্গে দিয়ে শিরকের মূলোৎপাটন করা উচিত’। উক্ত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে? তাদের ব্যাখ্যার জবাব কি হবে?

উত্তর : হাদীস বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেছেনঃ “ইয়াহুদ ও নাসারাগণ তাদের নবীদের মাযার সমূহকে কেবলা বানিয়ে ঐ দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতো এবং নিকটে গিয়ে মাযারে সিজদা করতো- সম্মানার্থে। এটা অবশ্যই হারাম- কিন্তু শিরক নয়। কেননা, তারা ইবাদত করতো আল্লাহর নামে। (কোন মানুষকে মাবুদ মনে করে সিজদা করা অবশ্যই শিরক।) (সন্মানের সিজদা হারাম এবং ইবাদতের সিজদা শিরক।

নবী করিম (দঃ) আপন উম্মতকে ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় নবী ও অলীর মাযার- কে তাজিমী সিজদা না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের মত মাযার সমূহকে কিব্লা না

বানাইতে কিংবা মাযারকে সিজদা না করার জন্যই তিনি নির্দেশ করেছেন। কোন বিবেকবান মুসলমানই তাদের মত হারাম কাজ করেনা। কোন জাহেল মূর্খ যদি তাজিম করে সিজদা করে- তবে তা হারাম হবে। কিন্তু শিরক হবেনা। মাযার চুষন করা সিজদা নয় বরং সুন্নাতে ফাতেমী।

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ)

অর্থ : শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে- কোন মুসলমান তার ইবাদত করবে। (অর্থাৎ কেউ তার ইবাদত করবেনা এবং শিরকেও লিপ্ত হবেনা)। তবে পরস্পরের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগানোর ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়নি”। (মুসলিম, তিরমিজি ও ইমাম আহমদ) সুতরাং মুসলমানের মধ্যে শিরকের আশঙ্কা নেই। ইহা নবী করিম (দঃ)- এর বানী। ইহা চির সত্য। কোন হারাম কাজ দেখলে শিরক শিরক বলে চিৎকার করা মহা অন্যায়। হারাম কে হারামই বলতে হবে এবং বন্ধ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা করতে হবে। বিরোধীরা মুসলমানকে মুশরিক বানানোর ক্ষেত্রে ওস্তাদ। উল্লেখ্য যে, মাযারে সিজদা করা হারাম। কিন্তু চুষন করা জায়েয। -অনুবাদক

অষ্টম অধ্যায়

কবর তাল্ফীন প্রসঙ্গে

(تَلْقِيْنُ الْقَبْرِ)

প্রশ্নঃ মূর্দাকে দাফন করার পর তাল্ফীন করা কি?

উত্তরঃ সাবালেক মূর্দাকে দাফন করার পর তাল্ফীন করা- জম্হুর উলামায়ে কেরামের মতে মোস্তাহাব। কেননা, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ-(الْقُرْآنُ)

অর্থঃ-“ তোমরা (জীবিত - মৃত) মুসলমানকে স্বরন করিয়ে দাও এবং তাল্ফীন করো। কেননা, স্বরন করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের অনেক উপকার হয়”। - আল কোরআন।

মসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তাল্ফীন করা শাফেয়ী মাযহাবের সকলের মতে, হাফলী মযহাবের অধিকাংশের মতে এবং হানাফী ও মালেকী মযহাবের বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে- মোস্তাহাব। কবরের ঘোর বিপদের কালে মৃত ব্যক্তিগন তাল্ফীনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে ওহাবী সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ ইবনে তাইমিয়াও তার ফতোয়ায় স্বীকার করেছে- যে, কবরের তাল্ফীন অনেক সাহায্যে কেরাম থেকে সাবেত আছে। সাহায্যে কেরাম তাল্ফীন করার জন্য লোকদেরকে বলতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাফল (রহঃ) বলেছেন- এতে কোন দোষ নেই, অর্থাৎ মাকরুহও নয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অনেক অনুসারী ওলামা তাল্ফীন করাকে মুস্তাহাব বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেছেনঃ কবরবাসীকে কবরে প্রশ্ন করা হয় এবং তারা তাদের জন্য দোয়া করার উপদেশও দিয়ে থাকে। সুতরাং তাল্ফীন তাদের উপকারে আসে। কেননা, মৃত ব্যক্তিগন জীবিতদের ডাক ও আহবান শুনেন। যেমন, সহীহ হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرَاعَ نِعَالِهِمْ وَقَالَ أَيْضًا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِي أَقُولُ لَهُمْ-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন - মৃত ব্যক্তির জীবিতদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। তিনি অন্য হাদীসে বদরের নিহতদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ “আমার কথা তোমরা বদরের নিহত কাফেরদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা”। সুতরাং তাল্ফীন করা মোস্তাহাব প্রমাণিত হলো।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! হাদীসে কি উপরোক্ত তাল্ফীনের বিষয়ে কোন নিয়ম বলা আছে?

উত্তরঃ হা! আছে। তাবরানী শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِّنْ أَخَوَانِكُمْ فَسَوِّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ أُرْشِدُنَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ- فَلْيَقُلْ-أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا-فَإِنْ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَامَا يَقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لَقِنَ حَبَّتَهُ-وَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ

يَعْرِفُ امَّهُ قَالَ فَيَنْسِبُهُ إِلَى امِّهِ حَوَاهُ يَقُولُ يَا فُلَانُ ابْنُ حَوَاهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন : তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মারা গেলে তাকে কবরস্থ করে উপরে মাটি ঠিকঠাক করে দিয়ে তোমাদের কেউ যেন তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে আহ্বান করে-“হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা”। সে এই ডাক শুনতে পায়। আবার ডাক দিবে-হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা। এবার সে সোজা হয়ে বসবে। তারপর আবার ডাক দিয়ে বলবে-হে ফলানা মহিলার পুত্র ফলানা। এবার সে বলবে “আমাকে কিছু উপদেশ দিন-আল্লাহ আপনাকে রহম করুন”। নবীজী বলেন-কিন্তু তোমরা তার কথা টের পাবে না। অতঃপর শিয়রে দাঁড়ানো ব্যক্তি যেন বলে, “তুমি দুনিয়া থেকে যে কলেমায়ে শাহাদাত নিয়ে বিদায় হয়েছো- তা স্মরণ করো; আর স্মরণ কর একথা যে, আমি রব হিসাবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দীন হিসাবে ইসলামের উপর রাজী, নবী হিসাবে মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে কোরআনের উপর সন্তুষ্ট”। নবী করিম (দঃ) বলেন : “এই তাল্কীনের পর মুন্কার-নকীর ফেরেস্তাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলাবলি করবে-চলো! যাকে নাজাতের দলীল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- তার কাছে বসে আর লাভ নেই”। একজন সাহাবী আরজ করলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! যদি মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে- তবে কার পুত্র বলবে? হুজুর (দঃ) বললেনঃ সকলের মা বিবি হাওয়ার দিকেই সম্পর্ক করে বলবে- হে বিবি হাওয়া (আঃ)-এর পুত্র ফলানা”। তাবরানী। (তাল্কীনের ইহাই নিয়ম)।

নবম অধ্যায়

অলীগনের দরবারে পশু জবাই প্রসঙ্গে
(الذَّبَائِحُ بِأَبْوَابِ الْأَوْلِيَاءِ)

প্রশ্নঃ আচ্ছা! অলী-আল্লাহগনের দরবারে যে গরু ছাগল জবাই করা হয় - শরীয়তে এর হুকুম কি?

উত্তরঃ অলী-আল্লাহগনের দরবারে যে গরু ছাগল- ইত্যাদি জবাই করা হয় - এগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে অলীগনের রুহে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে জবাই করা হয় এবং ঐ গোস্ত ফকির মিসকিন ও মাযারে অবস্থানকারী দরবেশ ও ফকির গনকে খাওয়ানো হয়। ইহাকে দেশী ভাষায় ওলীর নামের মান্নতও বলা হয়। এই মান্নত নফল। সমস্ত ইমামগনের ঐক্যমতে এরূপ করা মোস্তাহাব। কেননা, মৃতগনের রুহে ইহা ইছালে ছাওয়াবও তাদের প্রতি ইহসান স্বরূপ। নবী করিম (দঃ) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মৃতগনের প্রতি ইহসান করা ও তাঁদের রুহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য উন্নতকে উৎসাহিত করে গেছেন। উলামায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে- একমাত্র ওলীর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর নামের পরিবর্তে ওলীর নাম নিয়ে জবেহ করা হলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। কিন্তু কোন মতেই কাফের হবেনা। হাঁ! যদি ইবাদতের মানসে এরূপ করা হয়, তাহলে হারাম এবং শিরক হবে। কিন্তু কোন মুসলমানই এরূপ নিয়ত করেনা।

(বিঃ দ্রঃ) আমার লিখিত “ইসলাহে বেহেস্তী জেওর” গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ফতোয়া দেখুন।-অনুবাদক

প্রশ্ন : অলী-আল্লাহগনের খেদমতে হাদিয়া ও নযরানা পেশ করার বিধান আছে কি?

উত্তরঃ উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে- আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের মাযারে এই নিয়তে মানত করা জায়েয ও শুদ্ধ যে, মানতের বস্তু পাবে ওলীগনের বংশধর অথবা মাযারে অবস্থানরত ফকির মিসকিনগন ও খাদেমগণ অথবা মাযারের আশ পাশ উন্নয়নের জন্য মানতের টাকা পয়সা খরচ হবে এবং সাওয়াব পৌঁছানো হবে ওলীর রুহে। যিয়ারত ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করাও সুন্নাত। কাজেই মানতের টাকা পয়সা এখানেও খরচ করা যাবে।

অনুরূপ ভাবে- যদি উপরে উল্লেখিত কিছু নিয়ত না করে শুধু ওলীর নামেই মানত করা হয় এবং ঐ টাকা ফকির মিসকিন ও মাযার উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলেও সহীহ হবে। কিন্তু শুধু মাযারের সম্মানে এবং মাযারস্থ ওলীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মানত করা হলে শুদ্ধ হবে না। এরূপ করা জায়েয নেই। বলা বাহুল্য- এরূপ উদ্দেশ্যে কোন মানতকারীই মানত করেনা। বরং ওলীর দোয়া পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এরূপ মানত জায়েয। বিরোধীরা গায়ের জোরে ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানকে মুশরিক বানায়।

প্রশ্নঃ মুসলমানগন কর্তৃক ইনতিকাল প্রাপ্ত ওলীর নামে মানত করা ও পশু জবাই করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ মুসলমানগন মানতের মাধ্যমে ওলীর দরবারে হাদিয়া পেশ করে থাকেন এবং উহার সাওয়াব ওলীর রুহে পাকে বখশিশ করে রুহানী দোয়া চান- এটাই মূখ্য উদ্দেশ্য। কোন নবী বা ওলীর নামে মুসলমানগনের এরূপ মানত হাদিয়া হিসাবে গন্য হয় এবং এর সাওয়াব তাঁদের রুহে পাকে পৌছানো হয়। জীবিতদের পক্ষ হতে মৃত আত্মার জন্য এরূপ হাদিয়া পেশ করা শরীয়তে বৈধ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা হক পন্থী উলামাগনের এব্যাপারে ঐক্যমত হচ্ছে- জীবিতদের সদকা খয়রাত মৃতদের উপকার সাধন করে এবং তাঁদের রুহে পৌছে।

প্রশ্নঃ জীবিতদের সদকা খয়রাতের সাওয়াব যে মৃতদের রুহে পৌছে- তার দলীল কি?

উত্তরঃ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

১। মুলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوَصِّ أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করেন- জনৈক সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর

খেদমতে- আরজ করলেন, আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন- কিন্তু কোন অসিয়ত করে যাননি। আমি তাঁর জন্য কিছু সদকা করলে তিনি তাতে উপকৃত হবেন কি? হুজুর (দঃ) বললেন - হাঁ! (মুসলিম শরীফ)।

২। হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ أُمِّي قَدْ افْتَلَتَتْ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا لَوَعَاثَتْ لَتَصَدَّقْتُ أَفَأَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا يَنْفَعُهَا ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَنْفَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بَيْتًا وَقَالَ هَذِهِ لِمِ سَعْدٍ

অর্থঃ “হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করে বললেন, ইয়া রাসুল্লাহ (দঃ)! আমার আত্মজান ইনতিকাল করেছেন। আমি জানি - তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে নিজে সদকা খয়রাত করতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষে সদকা খয়রাত করলে তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন কি? হুজুর (দঃ) বললেন- হাঁ। হযরত সা'দ (রাঃ) পুনরায় আরজ করলেন - কোন্ ধরনের সদকা করলে তিনি বেশী উপকৃত হবেন? হুজুর (দঃ) এরশাদ করলেন- পানির ব্যবস্থা করলে। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) একটি কুপ খনন করে মায়ের নামে উৎসর্গ করে বললেন- ইহা সা'দ-এর মায়ের জন্য (আল বাছায়ের)।-সংগৃহীত

উপরে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার ভাবে প্রমানিত হলো যে, জীবিতদের দান এবং সদকা-খয়রাত মৃতদের অনেক উপকারে আসে। -অনুবাদক

দশম অধ্যায়

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা প্রসঙ্গে

(الْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ)

প্রশ্ন : আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করার শরীয়তি বিধান কি?

উত্তর : আল্লাহর দরবারে যাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত- যেমন নবী ও ওলী- তাঁদের নামে হলফ বা কসম করার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন- মাকরুহ এবং কেহ কেহ বলেন- হারাম। কিন্তু কেউই শিরক বলেন নি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো- নবী করিম (দঃ)-এর নামে হলফ বা কসম করা জায়েয। শপথ ভাঙতে হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা, নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন “ঈমানী সাক্ষ্য” বা কলেমার দুই রুকনের মধ্যে এক রুকন - অর্থাৎ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং হুজুর (দঃ)-এর মর্যাদা সবার উর্দে এবং একারনেই তিনির নামে শপথ করা জায়েয। কোন উলামায়ে কেরামই একথা বলেননি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করলে কুফরী হবে। হাঁ, আল্লাহর সমান সমান মর্যাদা মনে করে অন্যের নামে শপথ করা অবশ্যই কুফরী। কিন্তু কোন মুসলমানের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করা বাতুলতা বৈ আর কিছু নয়। হযরত আলীর (রাঃ) নামে শপথ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি- নিজের জীবনের শপথ করার প্রমাণও সাহাবীগণের মধ্যে পাওয়া যায়।

বিস্তারিত অবগতির জন্য আমার লিখিত “ইসলাহে বেহেস্তী জেওর দেখুন” - অনুবাদক

খোদা ছাড়া অন্যকে খোদার সমান মনে করে তাঁর নামে শপথ করা অবশ্যই শিরক এবং কুফরী। হাদীস শরীফে এরূপ হলফ করাকেই শিরক বলা হয়েছে।

যেমনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ-

অর্থ : “যে অন্যকে খোদার সমান মর্যাদাবান মনে করে তার নামে শপথ করে, সে অবশ্যই শিরক করলো।” কোন মুসলমান কি এরূপ মনে করে?

প্রশ্ন : কেউ কেউ কবরের বা কবরবাসীর কসম করে থাকে - এর হুকুম কি?

উত্তরঃ এরূপ কসম করা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। বরং এরূপ কসম করার অর্থ হচ্ছে- যাঁদের মর্যাদা ও সম্মান দুনিয়াতে ও আখেরাতে আল্লাহর নিকট প্রতিষ্ঠিত- তাঁদের উছীলা ধরা এবং তাঁদের নিকট সুপারিশ চাওয়া। কেননা- বান্দার কোন মাকসুদ পূরণের বেলায় আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করেন। মানুষের মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে উছীলা বানিয়েছেন। যেমনঃ কেউ বললো “আমি তোমাকে অমুকের কসম দিলাম অথবা এরূপ বললো- অমুক মাযারের অলী-আল্লাহর কসম দিলাম”। এরূপ বাক্য দ্বারা কোন ওলীর কসম করা কুফরী ও শিরক তো দূরের কথা- হারামও হবেনা। এই ব্যাখ্যা স্বরনে রাখুন এবং মুসলমানকে খামাখা কুফর ও শিরকে নিঃপতিত করা থেকে বিরত থেকে নিজেকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি- যেন তিনি আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে শিরক থেকে হেফাজত করেন এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে অন্য গুনাহ হতে মাগফিরাত করে দেন। আমিন!

-মূল লেখক

বিশেষ দলিল :

অন্যের নামে কসম করার বড় দলীল হচ্ছে- হযরত ওমর (রাঃ) নিজের জীবনের শপথ করেছেন। বসরার গভর্নর আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর নিকট লিখিত পত্রে হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ

أَمَّا بَعْدُ فَلَعَمْرِي يَأْعَمُرُو مَاتَبَالِي إِذَا شِيعَتْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ أَنْ

أَهْلِكَ أَنَا وَمَنْ مَعِيَ فَيَا غَوْثَاهُ ثُمَّ يَا غَوْثَاهُ يَرُدُّ قَوْلَهُ (حَاكِمٌ)
(بَيَّهَقِي)

অর্থ : “সালাম বাদ সমাচার এই- হে আমার! আমার (ওমর) জীবনের শপথ করে বলছি- তুমি এবং তোমার এলাকার লোকেরা ধনবান ও বিত্তশালী হয়ে আরামে দিন গুজরান করছো, আর আমি ও আমার এলাকাবাসী (মদিনাবাসী) লোকেরা না খেয়ে হালাক হয়ে যাচ্ছি। এতে তোমার একটুও পরওয়া নেই। দোহাই দিয়ে বলছি- আমাদের ফরিয়াদ শুনো, পুনরায় বলছি- আমাদের ফরিয়াদ শুনো এবং আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসো। এ কথাটা তিনি বার বার উচ্চারণ করছিলেন”। -সংগৃহীত (হাকেম ও বায়হাকী)।
-অনুবাদক

একাদশ অধ্যায়

কারামাত প্রসঙ্গ

(كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ)

প্রশ্নঃ অলী-আল্লাহুগনের জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরে তাঁদের থেকে কারামাত প্রকাশ পাওয়া কি সত্য?

উত্তর : হাঁ, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত যে সত্য- একথা বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। অর্থাৎ তাঁদের জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরও কারামাত প্রকাশ পাওয়া এবং বাস্তবে সংঘটিত হওয়া শুধু সম্ভব নয়- বরং দিবালোকের মতই সত্য। যাদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ এবং যাদের অন্তর কালিমা লিপ্ত, তারা ব্যতীত এই সত্যটি কেউ অস্বীকার করতে পারেনা।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! কারামাত সংঘটিত হওয়ার কোন প্রমাণ কোরআন-সুন্নাহতে আছে কি?

উত্তর : হাঁ! আছে। কোরআন মজিদে বহু কারামতের কথা উল্লেখ আছে। যেমনঃ
১। বিবি মরিয়ম ছিলেন বনী ইসরাইলের একজন মহিলা অলী আল্লাহ। তাঁর তিনটি কারামাতের কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আলে ইমরানে দুটি এবং সুরা মরিয়মে একটি। সুরা আলে ইমরানের দুটি ঘটনা হচ্ছেঃ

- (ক) আল্লাহর পক্ষ হতে বিনা মৌসুমের ফল আগমন
- (খ) তাঁর হুজরায় তাঁর খালু হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল ও সন্তান লাভ।

আল্লাহ তায়ালা দু’টি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى-

অর্থ : “বিবি মরিয়মকে যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে প্রেরণ করা হলো - তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ)। যখনই যাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়মের হুজুরায় প্রবেশ করতেন-তখন তাঁর নিকট গায়েবী রিজিক দেখতে পেতেন। যাকারিয়া (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন- হে মরিয়ম! কোথা হতে তোমার জন্য এসব আসলো? মরিয়ম জবাবে বললেন- এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন- হিসাব নিকাশ ছাড়াই রিজিক দিয়ে থাকেন। সেখানেই (ঐ কাম-রাতেই) যাকারিয়া (আঃ) তাঁর রবের কাছে দোয়া করে বললেন - হে আমার রব । আমাকেও তোমার পক্ষ হতে একটি পবিত্র সন্তান দাও । নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবনকারী । যাকারিয়া (আঃ) যখন নামাজে রত ছিলেন - তখন ফেরেশ্তারা এসে সু-সংবাদ দিয়ে বললো- আল্লাহ আপনাকে ইয়াহুইয়া নামক সন্তানের সু-সংবাদ দিচ্ছেন”।

উল্লেখ্য, অলীগনের দরবারে সহজেই দোয়া কবুল হয়- যেমন হয়েছে এখানে। আরও উল্লেখ্য যে, বিবি মরিয়মের কাছে গরম কালে আসতো শীত কালের ফল এবং শীতে আসতো গরম কালের।

বিবি মরিয়মের তৃতীয় কারামত বর্ণিত হয়েছে সুরা মরিয়মে এভাবেঃ

وَهُزِّيْ اِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا-

“হে মরিয়ম ! তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের ডালা ধরে নাড়া দাও- তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে”। (সুরা মরিয়ম ২৫ আয়াত) হযরত ইছা (আঃ)-এর জন্মের মুহূর্তে প্রসব বেদনায় যখন বিবি মরিয়ম কাতর ছিলেন- তখন আল্লাহ তায়াল্লা তাঁকে ইল্হামের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন - নিকটের মৃত খেজুর গাছের ডালে নাড়া দিলেই তাজা খেজুর এসে যাবে। এটা ছিল আশ্চর্য কারামাত।-অনুবাদক

আসহাবে কাহাফঃ

আসহাবে কাহাফ বা গুহাবাসী ৭ জন ওলীর কাহিনী কোরআন মজিদের ১৫ পারা সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা অত্যাচারী দাক্ইয়ানুছ বাদশাহর ভয়ে দেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে ছিল একটি পালিত কুকুর। তাঁরা সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক ঘুমে তিনশত নয় বৎসর কেটে গেল। খাওয়া দাওয়া ছাড়াই তাঁরা বেঁচে রইলেন। তাঁরা ডান বাম কাত হয়েছিলেন এবং সূর্যের উত্তাপ সেখানে পৌছতেনা। এটা ছিল আসহাবে কাহাফের কারামাত। তিনশত নয় বৎসর পর তাঁরা জাগ্রত হয়ে হাট বাজার করেছেন- খেয়েছেন। পরে পুনরায় ঐ গুহাতে তাঁরা আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তী কালে ভক্তরা উক্ত স্থানে ইবাদত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করেন ও স্থানটি সংরক্ষণ করেন। রুহুল মা-আনীর মতে-ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী স্থানটি পশ্চিম এশিয়ার জর্দানের নিকটে তরসুস শহরে অবস্থিত। অলীদের মহব্বতে ও সোহবতে কুকুরও বেহেস্তী হয়। - (মস্নবী শরীফ)

অন্যান্য ঘটনা : কোরআন মজিদে হযরত খিজির (আঃ)-এর কারামত, আসেফ বিন বরখিয়া কর্তৃক বিলকিস রানীর সিংহাসন চোখের পলকে ইয়েমেন থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে আনয়ন, জুলকারনাইন কর্তৃক পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ এবং ইয়াজুজ মাজুজকে প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো ছিল তাঁদের কারামত।-অনুবাদক

প্রশ্ন : হাদীসে কি কারামত সম্পর্কে কোন প্রমাণ আছে?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য কারামত, তাবেরীনগনের কারামত এবং পরবর্তী কালের অলী আউলিয়াগনের কারামত, যা বাস্তবে ঘটেছে- তা পৃথিবীময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং মানুষের মুখে মুখে তার চর্চা হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত, হযরত আলা ইবনে হাদরামী (রাঃ) কর্তৃক সসৈন্যে ঘোড়ায় চড়ে বাহরাইন সাগর পাড়ি দেয়া, হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও আগুনে না জ্বলা, হযরত খোবায়ব (রাঃ) কোরেশদের হাতে বন্দী দশায় বেহেস্তী ফল ভক্ষণ করা, হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ভীমরুল তাঁকে ঘিরে রেখে কোরেশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা- ইত্যাদি ঘটনা সমূহ এত সংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে- তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। কতিপয় ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছেঃ

أَنَّ سَيِّدَنَا خُبَيْبًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ فِي غَيْرِ
أَوَانِهَا وَهُوَ أَسِيرٌ بِمَكَّةَ مُوثَّقٌ بِالْحَدِيدِ وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ
ثَمَرَةٌ وَمَا هُوَ إِلَّا رِزْقُ رِزْقِهِ اللَّهُ أَيَّاهُ فَهِيَ كَرَامَةٌ لَهُ-

অর্থ “হযরত খোবায়ব (রাঃ) কে যখন কোরেশরা বন্দী করলো ইসলাম গ্রহণের কারণে-
তখন তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। এমতাবস্থায় তিনি বিনা মৌসুমের
ফল ভক্ষণ করছিলেন। মক্কায় তখন কোন ফল ছিলনা। ঐ ফল ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে
- যা আল্লাহ গায়েবী ভাবে তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কোরেশরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ
করেছে। এটা ছিল তাঁর কারামত”। (বোখারী শরীফ)

২। বোখারী শরীফে আরও উল্লেখ আছেঃ

أَنَّ سَيِّدَنَا عَاصِمًا لَمَّا قَتَلَ ارَّادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَأْخُذُوا قِطْعَةً مِنْ
جَسَدِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظِّلِّ مِنَ الدَّبْرِ وَهِيَ جَمَاعَةُ
النَّحْلِ وَالذَّبَابِ بَيْرٍ فَحَمَّتْهُ مِنْهُمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ
وَهَذِهِ كَرَامَتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ-

অর্থ “ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কার কোরেশরা হযরত আসেম (রাঃ)কে শহীদ করে
তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গচ্ছেদ করার মনস্থ করলো। আল্লাহ তায়ালা এক ঝাক মৌমাছি
বা ভীমরুল প্রেরণ করে মেঘের ন্যায় তাঁর শরীরকে ঢেকে ফেললেন। কোরেশরা তাঁর
কাছেও ঘেষতে সাহস করলোনা। শাহাদত বরণ করার পর এটা ছিল হযরত আসেম
(রাঃ)-এর কারামত”। বোখারী

৩। দুজন সাহাবীর হাতের লাঠি আলোময় হয়ে যায়ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- হযরত উসাইদ ইবনে হোযাইর (রাঃ) এবং উব্বাদ
ইবনে বশর (রাঃ) নামে দুজন সাহাবী এক অন্ধকার রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর সাথে
আলাপ করতে করতে রাত অধিক হয়ে যায়। যাওয়ার সময় নবী করিম (দঃ) দুজনকে
শুকনা খেজুর গাছের দুটি ডাল দিয়ে বললেনঃ এদুটি লাঠি তোমাদের সামনে দশগজ এবং
পিছনে দশগজ আলো দিবে। উক্ত সাহাবীদ্বয় যখন অন্ধকারে বের হলেন- সাথে সাথে
একজনের লাঠি জ্বলে উঠলো। উক্ত আলোতে দুজন চলতে লাগলেন। যখন উভয়ে
পৃথক হলেন- তখন উভয়ের লাঠি একসাথে জ্বলে উঠলো। তাঁরা ঐ আলোতে নিজ নিজ
বাড়ী পৌঁছে গেলেন- (বুখারী শরীফ)।

সুবহানাল্লাহঃ এজন্যই কোরআন মজিদে নবী করিম (দঃ) কে ‘সিরাজাম মুনিরা’ বা
আলোদানকারী চেরাগ বাতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই শুধু নূর নন্ বরণ নূর
বিতরনকারীও। তিনি ইচ্ছা করলে শুকনা ডালকে নূর বানিয়ে দিতে পারেন। হযরত
উসাইদ এবং হযরত উব্বাদ (রাঃ)-এর জন্য এঘটনাটি একটি অনন্য কারামত হিসাবে
গণ্য। -অনুবাদক

৪। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে ইরানের নিহাওয়ান্দ শহর জয় করার জন্য
হযরত ছারিয়া (রাঃ) কে সেনাপতি করে এক অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে শত্রুরা হযরত
ছারিয়া (রাঃ)-এর বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) মদিনা শরীফে
যাসারীয়ে জব্বল-
যাসারীয়ে জব্বল

“হে ছারিয়া! পাহাড়কে আশ্রয় করো”। সুদূর ইরান থেকে হযরত ছারিয়া (রাঃ) হযরত
ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং পাহাড়কে পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।
এভাবে মুসলিম বাহিনী ধংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। দূরে সেনাবাহিনীকে দেখা ছিল
হযরত ওমরের (রাঃ) কারামত এবং দূরের কথা শুনা ছিল হযরত ছারিয়ার কারামত।
তরজুমানুস সুন্নাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সংগৃহীত)।

৫। হযরত আলা ইবনে হাদরামী (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর পত্র নিয়ে ৭ম হিজরীতে
বাহরাইনের অধিপতির কাছে গিয়েছিলেন। সেখানকার কয়েকজন মাত্র লোক তাঁর
আহবানে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু বাহরাইন অধিপতি ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত
ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে বাহরাইন জয় করার জন্য হযরত আলা ইবনে হাদরামী
(রাঃ) কে সেনাপতি করে চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। সবাই ছিলেন

ঘোড় সওয়ার। হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবীগণ সমন্বয়ে উক্ত বাহিনী গঠিত হয়েছিল। হযরত আলা ইবনে হাদরামী (রাঃ) আপন বাহিনী নিয়ে রওনা দিয়ে পশ্চিমদিকে নদীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। তিনি দু রাকআত নফল নামাজ পড়ে **يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيَّ يَا عَظِيمُ-اَجْزَنَا** পাঠ করে নিরাপদে কুদরতি ভাবে নদী পার করানোর জন্য খোদার দরবারে সকলকে নিয়ে দোয়া করে বল্লেন- হে আল্লাহ! আমাদেরকে পার করে দাও। এর পর তিনি সকলকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিস্মিল্লাহ বলে নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়লেন। এই ঘটনার রাবী হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা ঘোড়ায় চড়ে পানির উপর দিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু খোদার কসম- আমাদের পা তো দূরের কথা, আমাদের ঘোড়ার ক্ষুরও পানিতে ভিজেনি।- তরজুমানুস সুন্নাহ- ইসলামী ফাউন্ডেশন।(সংগৃহীত)

৬। হযরত আবু মুসলিম খাওলানীর (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষাঃ

সুরাহবিল ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেনঃ আসওয়াদ আনাসী নবুয়তের ভণ্ড দাবীদার ছিল। সে ইয়েমেনে নবুয়তি দাবী করেছিল। সে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) কে ধরে নিয়ে আসল। তাকে নবী মানার জন্য আবু মুসলিম খাওয়ানী (রাঃ)-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলো। কিন্তু টলাতে পারলনা। অবশেষে আসওয়াদ আনাসী একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তাতে আবু মুসলিম খাওলানীকে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত আগুন তাঁর জন্য ঠান্ডা হয়ে গেল। তিনি স্বশরীরে অগ্নিকুণ্ড হতে নেমে আসলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) ঘুরতে ঘুরতে মদিনা শরীফ এসে উপস্থিত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পরিচয় নিয়ে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- যিনি উম্মতে মোহাম্মদীর এমন এক ব্যক্তিকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দেন নি- যার সাথে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর ন্যায় আচরন করা হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত - তরজুমানুস সুন্নাহ - ইসঃ ফাউন্ডেশন) (সংগৃহীত)

৭। আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) মৃত ও ডুবন্ত বরযাত্রীদেরকে ১২ বৎসর পর জীবিত করেছিলেন। খাজা গরীব নওয়াজ আনা সাগরের পানি লোটোর মধ্যে ভরেছিলেন। হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) বেহস্ত হতে গরম কেক এনে মেহমানদারী করতেন। সেজন্য তাঁর লকব হয়েছিল কাকী। আরও অসংখ্য কারামত তাজকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে। (সংগৃহীত)

মূলতঃ আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত নবী করিম (দঃ)-এর মুজিয়ারই ফল। নবীর জন্য যে কাজটি মোজেয়া- অলীর ক্ষেত্রে সে কাজটিই কারামত বলে গন্য। একই কাজ- কিন্তু পাত্র ভেদে নাম বদলে যায়। নবীগনের মুজিয়া হয় সরাসরি আল্লাহর দান- আর অলীগনের কারামত হয় নবজীর মাধ্যমে ও উচ্ছিয়ায়। উলামায়ে কেরাম বলেছেন- এমন আশ্চর্যজনক খেলাফে আদত কোন কাজ কাফের থেকে প্রকাশ পেলে তাকে জাদু বলা হয়। হাওয়ায় ভ্রমন করা, পানিতে চলা- অলীদের থেকে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আর কাফের ও ফাছেক থেকে প্রকাশ পেলে ইছতিদরাজ বা যাদুমন্ত্র বলা হয়। (কিমিয়ায়ে ছায়াদাত)-অনুবাদক।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর দীদার প্রসঙ্গে

(رُؤْيَا النَّبِيِّ يَقْظَةً)

প্রশ্নঃ জাগ্রত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর দর্শন লাভ করা কি সম্ভব ও বাস্তব?

উত্তরঃ জাগ্রত অবস্থায় নবী করিম (দঃ)-এর দীদার লাভ করা সম্ভব এবং বাস্তবে ও তা ঘটেছে। আলেমগন উল্লেখ করেছেন যে, অনেক অলী আল্লাহই নবী করিম (দঃ) কে স্বপ্নে দেখার পর পুনরায় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন এবং তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের অনেক কিছু জেনেও নিয়েছেন। এটা তাঁদের কারামতের অংশ।।

প্রশ্নঃ উক্ত সম্ভাবনা ও বাস্তবতার কোন দলীল ও প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ
فَسِيرَانِي فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَمْتَلِ الشَّيْطَانُ بِي-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। শয়তান আমার সুরত ধারণ করতে পারেনা”। (বোখারীও মুসলিম)

হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগন এভাবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন- এই হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ)-এর যে উম্মত স্বপ্নাবস্থায় দীদারে মোস্তাফার দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে পেরেছে, সে মৃত্যুর পূর্বেই জাগ্রত অবস্থায়ও নবীজীকে দেখতে পাবে- ইন্শাআল্লাহ। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হলেও সে অবশ্যই দেখবে। একই সময়ে লক্ষ জায়গায় এভাবে নবী করিম (দঃ) হাজির হতে পারেন।

কোন কোন কম এলেমের লোক এই হাদীসের অপব্যখ্যা করে বলেছে যে, হাদীসের মধ্যে ‘মানাম ও ইয়াকজা অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা’ অর্থ- যথাক্রমে কবর ও হাশর। এটা তাদের ভুল ব্যাখ্যাও হাদীসের মর্ম পরিবর্তন মাত্র। কেননা, কবরে ও হাশরে তো সমস্ত উম্মতই, এমনকি- কাফিরও হুজুর (দঃ) কে দেখতে পাবে। এটা পরীক্ষার জন্য। এটা তো সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং পরীক্ষার বিষয়। অথচ হাদীসের মর্ম হচ্ছে সৌভাগ্যও কারামত হিসাবে।

বর্ণিত হাদীস খানা অতি ব্যাপক এবং অনেক মাস্য়ালা ও আকিদার মীমাংসাকারী দলীল।
যথাঃ

১। নবী করিম (দঃ) একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে স্বপ্নে দেখা দিতে এবং স্বশরীরে হাজির হতে পারেন। কেননা, উম্মাত যেখানে- তাঁর দীদারও সেখানেই। তিনি পৃথিবীময় হাজির ও নাজির।

২। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) বলেছেন, এ সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসের সারকথা হলো- নবী করিম (দঃ) শরীর ও রূহ মোবারক সমন্বয়ে দেহধারী হিসাবে জীবিত আছেন। তিনি দুনিয়ার জীবদ্দশার মতই এখনও আসমান জমিনের যথায় ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ (تَصَرَّفُ) করতে সক্ষম। কিন্তু ফেরেস্টাদের মতই তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে বিরাজমান। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন- তখন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের থেকে পর্দার অন্তরায় সরিয়ে নেন এবং ঐ বান্দা তাঁকে দেখেন। এটা ঐ বান্দার কারামত। নবীজী সর্ব জায়গায় আছেন, কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে। টিভির ছবি ইথারের মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। চাবি অন (on) করলেই দেখা যায়- কিন্তু অফ (off) করলে দেখা যায়না। নবীজীর অবস্থানের এবং হাজির হওয়ার বিষয়টিও তদ্রূপ। -অনুবাদক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খিজির আলাইহিস সালাম জীবিত থাকার প্রসঙ্গ

(حَيَاةُ الْخَضِرِ)

প্রশ্ন : কারামত বা মোজেজা স্বরূপ হযরত খিজির (আঃ) কি এখনও জীবিত আছেন?

উত্তরঃ সংখ্যা গরিষ্ঠ উলামায়ে ইসলামের মতে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম নবী এবং এখনও জীবিত আছেন। আম- খাছ সর্ব লোকের কাছেই এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ। ইবনে আতাউল্লাহ (রহঃ) তাঁর লাভায়েফ গ্রন্থে লিখেছেনঃ প্রত্যেক যুগের অলীগনই হযরত খিজির (আঃ)-এর দর্শন পেয়েছেন এবং তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও ফয়েজ লাভ করেছেন। এত সংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, তাতে অবিশ্বাস করা বা সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। মোতাওয়াতের ঘটনার দ্বারা খিজির (আঃ)-এর স্বশরীরে দর্শন প্রমানিত হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার দুই শাগরেদ যথাক্রমে ইবনে কাইয়েম তার ‘মুছিরুল গারাম’ গ্রন্থে এবং ইবনে কাছির তার ‘বেদায়া ও নেহায়া’ গ্রন্থে খিজির আলাইহিস সালামের জীবিত থাকার চাক্ষুস প্রমান বর্ণনা করেছেন। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম তরিকতের নবী এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পূর্বকার লোক (তাকসীরে নাস্বী)।

জীবিত থাকার প্রমান

১। ইমাম বায়হাকী দালায়েলুননুবুয়াত নামক হাদীস গ্রন্থে এবং ইবনে কাছির বেদায়া- নেহায়া জীবনী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ

أَنَّهُ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُوا صَوْتًا
مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ- إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَاهُ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلْفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ
وَدَرْكًَا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللَّهِ فَتَّقُوا وَآيَاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ
مَنْ حَرَّمَ الثَّوَابَ- فَقَالَ عَلَى كَرَمِ اللَّهِ وَجْهَهُ أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟
هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) যখন ইনতিকাল করেন তখন আহলে বাইতের সকলেই হুজরা মোবারকের এক কোনা থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন- হে আহলে বাইতের সদস্যগণ। আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। প্রত্যেক প্রাণীরই একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। আপনারা পরকালে আপনাদের কর্মফল পরিপূর্ণ ভাবেই পাবেন। প্রত্যেক মুসিবতে আল্লাহতেই শান্তনা খুঁজে পাওয়া যায়; প্রত্যেক ধংসশীলের উত্তরসূরীও আল্লাহর পক্ষ হতেই বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেক হারানো জিনিসের পরবর্তী প্রাপ্তিও আল্লাহর পক্ষ হতেই পাওয়া যায়। আল্লাহকে মজবুত করে ধরান এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করুন। কেননা, যে ব্যক্তি সাওয়াব থেকে মাহরুম হয়ে যায়, সেটাই তার জন্য বড় মুসিবত। হযরত আলী (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করে বললেন- আপনারা কি চিন্তে পেরেছেন---- ইনি কে আওয়াজ দিচ্ছেন ? ইনিই খিজির আলাইহিস সালাম। (ইমাম বায়হাকির দালায়েলুননুবুয়াত)

হযরত খিজির (আঃ) হযরত মুহা আলাইহিস সালামের সাথে স্বশরীরে ভ্রমণ করেছেন এবং তিনটি আশ্চর্য মোজেজা প্রদর্শন করেছেন। যার মর্ম হযরত মুহা (আঃ) বুঝতে পারেননি। হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) স্বশরীরে হযরত খিজির আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন। এখনও অনেক ওলীর সাথে তিনি দেখা করেন। সুতরাং অনেক প্রমাণিত দলীলের মাধ্যমেই তাঁর জীবিত থাকার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। -অনুবাদক

চতুর্দশ অধ্যায়

কোরআনের আমল দ্বারা রোগমুক্তি প্রসঙ্গে

(الْأَسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ)

প্রশ্নঃ কোরআন মজিদ হেদায়াতের জন্য এসেছে। কোরআনী আমল করে কি রোগমুক্তি লাভ করা যায়?

উত্তরঃ কোরআন মজিদ হেদায়াত, রহমত, সমস্ত সমস্যার সমাধান এবং শিফা হিসাবেও অবতীর্ণ হয়েছে। রোগ সমস্যার সমাধান কোরআনে না থাকলে তা পরিপূর্ণ বিধান হয় কি করে? আল্লাহ তায়ালা রোগমুক্তির জন্য যা কিছু পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কোরআন মজিদের চেয়ে বড় শিফা বা রোগমুক্তির আর কিছু অবতীর্ণ করেন নি। এই কোরআন- রোগের জন্য শিফা এবং অন্ধ কলবের জন্য শান ও রেত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ-

অর্থঃ “আমি কোরআন মজিদের কিছু অংশ জাহেরী ও বাতেনী এবং দেহের ও অন্তরের রোগব্যাদির জন্য শিফা স্বরূপ এবং মু’মিনদের জন্য রহমত স্বরূপ নাযিল করেছি”। (সুরা বনী ইসরাঈল)

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ لَمْ يَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شِفَاءَ لَهُ مِنَ اللَّهِ-

অর্থঃ “যে ব্যক্তি কোরআনের দ্বারা রোগমুক্ত হতে পারেনি- তার জন্য যেন আল্লাহ কোন শিফা মঞ্জুর না করেন”।

কোরআন মজিদে সর্বরোগের শিফা আছে। কিন্তু ব্যবহার বিধি পালন বা আমল না করার

কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যাচ্ছেনা। এই ক্রেটি মানুষের। ব্যবস্থা পত্রের নয়। যেমন, বন্দুক আছে-গুলিও আছে। কিন্তু ট্রিগার টিপতে না জানলে কাজ হয় না।-অনুবাদক

প্রশ্নঃ রোগের জন্য কোরআন, হাদীস- ইত্যাদি দ্বারা ঝাঁড় ফুঁক করা এবং তাবিজ দেয়া জায়েয কিনা? কোন কোন বইতে দেখা যায়- জায়েয নেই। তাদের জবাব কি?

উত্তরঃ দ্বীনের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও উলামাগন বলেছেন যে- তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঝাঁড় ফুঁক ও তাবিজ দোয়া করা জায়েয। শর্ত তিনটি হচ্ছে-

১। ঝাঁড় - ফুঁকের দোয়া আল্লাহর কালাম ও রাছুলের হাদীস এবং আল্লাহর নাম ও শিফাতের দ্বারা হতে হবে।

২। আরবী ভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে অন্যান্য ভাষায়ও হতে পারে- যদি অর্থ বোধগম্য হয় এবং শিরক ও কুফর মিশ্রিত কোন বাক্য না হয়।

৩। ঝাঁড়, ফুঁক বা তাবিজ দোয়ার নিজস্ব কোন পৃথক ক্ষমতা নেই-বরং আল্লাহ তায়ালা হুকুমে বা ইচ্ছায় এবং ঝাঁড়, ফুঁক ও তাবিজ দোয়ার উচ্ছিন্ন রোগ মুক্ত হয়। শিফা দানকারী আল্লাহ। ঝাঁড়, ফুঁক ও তাবিজ দোয়া উচ্ছিন্ন মাত্র- এই আক্কেদা পোষন করতে হবে।

প্রশ্নঃ ঝাঁড় ফুঁক জায়েয হওয়ার দলীল কি?

উত্তরঃ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত কৃত হাদীসঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَعْرَضُوا عَلَى رِقَاكُمْ لِأَبَاسٍ بِالرَّقِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত -তিনি বলেনঃ আমরা জাহেলিয়াত যুগে

(দেবদেবীর নামে) ঝাঁড় ফুঁক করতাম। মুসলমান হওয়ার পর আমরা হজুর (দঃ) কে আরজ করলাম, ইয়া রাসুল্লাহ (দঃ)! আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন? হজুর (দঃ) এরশাদ করলেন : “তোমাদের ঝাঁড় ফুঁকের দোয়া আমার কাছে পেশ করো। যদি তাতে শিরকের বিষয় না থাকে, তাহলে ঝাঁড় ফুঁকে কোনই দোষ নেই”। এতে বুঝা গেল, ঝাঁড় ফুঁক করা নির্দোষ ও বৈধ। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্নঃ কোন ধরনের ঝাঁড় ফুঁক নিষিদ্ধ?

উত্তরঃ আরবী ব্যতীত অথবা সুবোধ্য ভাষা ব্যতীত অন্য কোন দুর্বোধ্য ভাষায় ঝাঁড় ফুঁক করা বা মন্ত্র দ্বারা ফুঁক দেয়া হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা, ঐ গুলোতে শিরকী বা কুফরী কালামও থাকতে পারে অথবা যাদুমন্ত্রও হতে পারে- যা হারাম। হাঁ, যদি শুদ্ধ অর্থ বোধক কালাম হয়, যেমন- আল্লাহর যিকির অথবা আল্লাহর নাম ও সিফাত যোগে কোন কিছু পাঠ করা হয় বা লিখা হয়, তাহলে অবশ্যই জায়েয হবে। বরং মোস্তাহাব কাজও বটে এবং বরকত পূর্ণও। সুরা ফাতেহা, নাহ, ফালাক, ইখলাছ- ইত্যাদি পাঠ করে ঝাঁড় ফুঁক করলে সর্বরোগ আরোগ্য হয়। (আল হাদীস)

প্রশ্ন : তাবিজ লিখা ও ধারণ করা জায়েয কিনা?

উত্তর : যে সব কালামে বা বাক্যে কোন যাদু মন্ত্র নেই এবং যার ভাষাও অবোধ্য নয়- এমন সব কালাম দ্বারা এবং কোরআন ও হাদীস দ্বারা তাবিজ লিখা ও তা ধারণ করা জায়েয। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহেও ঐ তাবিজ ধারণ করা সহীহ মাযহাব মতে এবং মোহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতে জায়েয। ইবনে কাইয়েম নিজ গ্রন্থ “যাদুল মাআদ”-এ ইবনে হিব্বান হাদীস গ্রন্থ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে- ইবনে হিব্বান ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন- তাবিজ ধারণ করা জায়েয কিনা?

ইমাম জাফর (রাঃ) বললেনঃ “যদি আল্লাহর কালাম হয় অথবা নবীজীর হাদীস শরীফ হয়- তাহলে ধারণ করো এবং ঐ তাবিজের মাধ্যমে শেফা প্রার্থনা করো”। ইহাও উল্লেখ আছে যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) কে তাবিজ ধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন- “বালা মুসিবত নাজিল হওয়ার পর তাবিজ ধারণ করা মাকরুহ তো নয়ই-

বরং কোন দোষও নেই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন- আমি আমার আব্বাকে হৃদকম্প রোগী ও জুরে আক্রান্ত রোগীর জন্য তাবিজ লিখতে দেখেছি। ওহাবী নেতা ইবনে তাইমিয়াও তার ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে, অনেক বর্ণনা কারীই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) কোরআনের আয়াত, জিকির আজকারের কলেমা ও বাক্য দ্বারা তাবিজ লিখতেন এবং রোগীকে উক্ত তাবিজের ধৌত পানি পান করানোর জন্য বলতেন। এতেই বুঝা যায় যে- তাবিজের মধ্যে রহমত ও বরকত আছে। ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর তাবিজ লিখাই প্রমান করে যে- তাবিজ ধারণ করা জায়েয।

উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের ওহাবী বাদশাহরা হাম্বলী মযহাব ও ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী বলে দাবী করে। অথচ তারা তাদের ইমামের কথা মানেনা। বর্তমানে তারা বিভিন্ন পুস্তক বাজারে ছেড়েছে। ঐ গুলিতে শবে বরাত, শবে কুদর, দোয়া তাবিজ ও ঝাঁড় ফুঁক, কবর ঘিয়ারত- ইত্যাদিকে হারাম বলা হয়েছে। তারা নিজ নেতাদের অনুসরণ করলে আকিদার এই সংকট দেখা দিতনা এবং ঐ সব বই পড়ে মানুষও গোমরাহ হতোনা। -অনুবাদক

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে তাবিজ ধারণ করাকে শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ “مَنْ عَلَّقَ تَبِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ” “যে তাবিজ লটকালো- সে শিরক করলো”। (আলহাদীস) অথচ আপনি বললেন- জায়েয। তাহলে হাদীসের আসল ব্যাখ্যা কি?

উত্তরঃ হাদীসে শিরক বলা হয়েছে ঐ তাবিজকে- যা জাহিলিয়াত যুগে চামড়ার গলাবন্দ বা নল নইছা ইত্যাদি হিসাবে লটকানো হতো। তারা বিশ্বাস করতো যে- ঐ গুলোই বালা দূর করে। তারা যা করতো- তা ছিল শিরকের ধারণা প্রসূত। যেমন- তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ছাড়া ঐ গলাবন্দই অসুখ ভাল করে এবং উপকার করে। ঐ গুলোতে আল্লাহর নামও কালাম কিছুই থাকতোনা। কাজেই ঐগুলো হারাম ও শিরক। কোরআন হাদীস সম্মত তাবিজ বৈধ এবং সুন্নাতে সাহাবা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মিলাদ-কিয়াম ও বিদ্‌আত প্রসঙ্গে

(عَمَلُ الْمَوْلِدِ وَأَقْسَامُ الْبِدْعَةِ)

প্রশ্নঃ নবী করিম (দঃ)-এর নূর সৃষ্টি ও পবিত্র বেলাদতের আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আকারে মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য লোক জমায়েত হওয়া জায়েয কিনা?

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান- যেখানে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক নবী করিম (দঃ)-এর নূর সৃষ্টি ও জন্মের আদি বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয় এবং জন্মকালীন মোজিয়া সমূহ বর্ণনা করে ছালাত ও ছালামের মাধ্যমে কেয়াম করা হয়- তা জায়েয ও বিদ্‌আতে হাছানার (উত্তম বিদ্‌আত) অন্তর্ভুক্ত মোস্তাহাব কাজ। এতে সওয়াব হয়। কেননা, এতে রাসুলে পাক (দঃ)-এর শান- মান ও মর্যাদার আলোচনা করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং মিলাদ শরীফের আয়োজন কারীর জন্য সুসংবাদ প্রচার করা হয়। নবী করিম (দঃ) বলেনঃ “যারা আমার কথা আলোচনা করে-আমি তাদের সাথে থাকি”। (মাদারেজুমবুয়ত)

মিলাদ অনুষ্ঠান করা আল্লাহ, ফেরেস্টা ও আশ্বিয়ায়ে কেরামের তরিকা : প্রথম মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারোজে আযলের দিনে। উক্ত পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর এবং তাঁরা কেয়াম অবস্থায় আল্লাহ কর্তৃক মিলাদ শরীফের বর্ণনা শুনেছিলেন (সূরা আল এমরান ৮১-৮২ আয়াত)। সেদিন আল্লাহ স্বয়ং নবীজীর আবির্ভাব ও বেলাদত শরীফের বয়ান দিয়েছিলেন নবীগণের কাছে। নবীগণ কেয়াম সহ ঐ বয়ান শুনেছিলেন। দুনিয়াতে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) কেয়াম সহকারে নবী করিম (দঃ)-এর আগমনের জন্য খোদার কাছে দোয়া করে ছিলেন (বেদায়া-নেহায়া)। হযরত ইছা আলাইহিস সালাম নবীজীর ৫৭০ বৎসর পূর্বে কেয়াম অবস্থায় নবী

করিম (দঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন- বলে ইবনে কাছির তাঁর অমর গ্রন্থ “আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া” ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদ শরীফের বিভিন্ন সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, হযরত মারুফ কারাখী, সিররি সক্তি, জোনায়েদ বাগদাদী, ইমাম রাজী, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার হায়তামী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি, ইমাম তাকিউদ্দীন সুব্কি, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী- প্রমুখ মোহাদ্দেস, মোফাসসির ও বুয়ুর্গানে দ্বীন মিলাদ এবং কিয়ামের ফজিলত নিজ নিজ কিতাবে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। মিলাদ ও কিয়ামের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে হলে আমার লিখিত মিলাদ ও কিয়ামের বিধান বা আহ্‌কামুল মিলাদ ওয়াল কিয়াম গ্রন্থ খানি দেখুন।-অনুবাদক

মিলাদ ও কিয়াম বিরোধী আশ্রাফ আলী খানবী ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং সমস্ত দেওবন্দের পীর ও বুয়ুর্গগণের পীর মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী সাহেব নিজে মিলাদ ও কিয়াম করতেন এবং তাতে অত্যন্ত স্বাদ পেতেন- বলে রেছালায়ে হাফ্ত মাছায়েল পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। সংগ্রহ করে দেখুন-অনুবাদক।

প্রশ্নঃ আচ্ছা! বিদ্‌আত বলতে তো আমরা সাধারণতঃ খারাপ বুঝি। বিদ্‌আতের কোন শ্রেণী ভেদ আছে কিনা? মিলাদ ও কিয়াম কি খারাপ?

উত্তরঃ বিদ্‌আত অর্থ- ‘রাসুল করিম (দঃ)-এর পরে অদ্যাবধি যে সব কাজ-কর্ম ধর্মের সহায়ক হিসাবে নূতন সংযোজিত হয়েছে’। ঐ গুলির মধ্যে কোরআন সুন্নাহর আলোকে ভালগুলো ভাল এবং মন্দগুলো মন্দ। সুতরাং উলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দেসীনগন বিদ্‌আতকে প্রথমতঃ দুভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। যথা (১) বিদ্‌আতে হাছানাহ্ (২) বিদ্‌আতে ছাইয়েআহ্। মিলাদ ও কিয়াম প্রথম শ্রেণীভুক্ত।

প্রশ্নঃ বিদ্‌আতে হাসানাহ্ কি? এবং উহা কত প্রকার?

উত্তরঃ ইমাম ও মোজতাহিদগন যেসব কাজকে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ভাল বলেছেন- সেগুলোকে বিদ্‌আতে হাসানাহ্ বলা হয়। এগুলো আল্লাহর কোরআন ও রাসুলে পাকের (দঃ) হাদিস দ্বারা অনুমোদিত। যেমনঃ প্রথম কোরআন সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ২০ রাকআত তারাবিহ, পৃথক খানকাহ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, চার তরিকার যিকির-আযকারের নিয়ম পদ্ধতি, জুমার প্রথম আযান, মসজিদের মেহরাব নির্মাণ, কোরআন শরীফের জের জবর সংযোজন ও অন্যান্য আধুনিক কল্যাণমূলক কাজ। এগুলো বিদ্‌আতে

হাসনাহ্।

প্রশ্নঃ বিদ্বাতে হাসানাহ্ কত প্রকার ও কি কি? মিলাদ ও কিয়ামের হুকুম কি?

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ইবনে আবদুস সালাম (রহঃ) বিদ্বাতে হাসানাহ্কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

১। বিদ্বাতে ওয়াজিব : যেমন- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কর্তৃক গোটা কোরআন শরীফ ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও কাগজ থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করে ৩০ পারা করা, ১০০ বৎসর পরে হাদীস শরীফকে বিভিন্ন রাবী থেকে সংগ্রহ করে কিতাব আকারে প্রণয়ন করা (সিহাহ্ সিগাহ্ ও এর অন্তর্ভুক্ত), দ্বীনী এলেম শিক্ষা করার সুবিধার্থে ফেকাহ্, উসুল, এলেমে নাহ্-ছরফ, ফারাজেজ- ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করা এবং পৃথক মাদ্রাসা তৈরী করা- ইত্যাদি।

২। বিদ্বাতে সুন্নাত : যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক জামাতের সাথে বিশ রাকআত তারাবিহ নামাজের প্রচলন করা, হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক জুমার নামাজের প্রথম আযান প্রবর্তন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান করা- ইত্যাদি।

৩। বিদ্বাতে মোস্তাহাবঃ যেমন, রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর তিরোধানের ৮৬ বৎসর পর কোরআন মজিদে নোক্তা ও হরকত সংযোজন করা। একাজটি করেছিল উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে ইরাকের গর্ভনর হাজজাজ বিন ইউসুফ ছাকফী।

৪। বিদ্বাতে মোস্তাহসান : যেমন- মসজিদ ও কোরআন শরীফকে সোনালী-রূপালী রং দ্বারা ও লতা পাতা এবং বিভিন্ন নকশা দ্বারা সাজানো, মিলাদ শরীফ পাঠ কালে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কালে কেয়াম করা ও সালাত সালাম পাঠ করা- ইত্যাদি।

৫। বিদ্বাতে মোবাহঃ যথা- উত্তম খাদ্য খাওয়া ও উত্তম পোষাক পরিধান করা, পালাও- বিরয়ানী খাওয়া, জাক-জমকের সাথে যিয়ারত করা- ইত্যাদি। -অনুবাদক

বিদ্বাতের এই প্রকারভেদ ও বৈধতা সম্পর্কে হাদীসের যে কোন ছাত্রই অবগত আছেন।

এগুলো কোরআন ও হাদীস দ্বারা অনুমোদিত। কেবল ওহাবী সম্প্রদায়ই এতে ঝগড়া বাধায়। তারা একদিকে বিদ্বাতী কাজ করছে- অন্যদিকে এগুলোকে হারামও বলছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিদ্বাতে হাসানাহ্ অন্তর্ভুক্ত। ২০ রাকআত তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় করাকে হযরত ওমর (রাঃ) **نِعْمَ الْبِدْعَةُ** বা উত্তম বিদ্বাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ইহা সুন্নাত। শুধু রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পরে হওয়ার কারণেই তিনি বিদ্বাত বলেছেন। সব বিদ্বাত ত্যাজ্য হলে জামাতের সাথে ২০ রাকআত তারাবিহও ত্যাজ্য বলে মানতে হয়।

বিদ্বাতে হাসানাহ্ (নূতন প্রথা) প্রবর্তনে নবীজীর উৎসাহ দান :

নবী করিম (দঃ) উত্তম বিদ্বাত প্রচলনের জন্য অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন- হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থ : “যে কোন যুগের যে কোন যোগ্য ব্যক্তি ইসলামে উত্তম প্রথা চালু করবে, সে তার উদ্যোগের পুরস্কার তো পাবেই- তদুপরি ঐ কাজ আমলকারীদের বরাবর সাওয়াবও সে পাবে। কিন্তু আমলকারীদের সাওয়াব কম দেয়া হবেনা” - মুসলিম শরীফ।

উক্ত হাদীস খানা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং যুগজিজ্ঞাসার সমস্ত সমস্যা সমাধানের নীতিমালা স্বরূপ। এই হাদীসের মাধ্যমে নবী করিম (দঃ) নিজ উম্মতের ইমাম ও মুজতাহিদ শ্রেণীর ওলামাগনের গবেষনার জন্য পথ খোলা রেখে দিয়েছেন- যেন যুগের প্রয়োজনে নিত্য নূতন সমস্যার সমাধানের পথ তাঁরা খুজে বের করতে পারেন। ইসলামে আল্লাহ্ ও রাসুল কতেক বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত, ফারাজেজ- ইত্যাদি। এগুলোতে ইজতিহাদের তেমন সুযোগ নেই। সবগুলোই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু কিছু কাজ ও আমল এমন রেখেছেন- যে গুলোতে ইমামগনের ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। যেমন- বিভিন্ন দেশীয় প্রথা ও আচার-আচরন। এগুলোকে সরাসরি

নিষেধ না করে আল্লাহ্ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছেন।
যেমন- কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ-

অর্থ : “তোমরা ভাল ও উত্তম কাজ করো- তাহলে সফল হবে”। এখানে আল্লাহ্ উত্তম কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। বরং নীতিমালার উপর সোপর্দ করেছেন। এই আয়াত খানা আলেমগনের স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে গোড়ামী চলে যাবে এবং দৃষ্টিকোন প্রসারিত হবে। জনগনের কাছেও তারা গ্রহণযোগ্য হবেন।

হাদীস শরীফে উম্মতের বিশেষজ্ঞগনকে সর্বসম্মত নিত্য নূতন ভাল কাজের উদ্ভাবনের সুযোগ দান করে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ-

অর্থ : “মোমেনগন যে কাজকে ভাল বলে সাব্যস্ত করবে- আল্লাহর নিকট পূর্বেই তা ভাল বলে বিবেচিত আছে”। বান্দা শুধু প্রকাশের বাহন মাত্র। উম্মতের ইমামগনকে উক্ত হাদীস দ্বারা ইজতিহাদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মোমেন বান্দারা হলেন আল্লাহর সাক্ষী। ইমামগন ইজতিহাদ করে সর্বসম্মতভাবে মিলাদ ও কিয়ামকে উত্তম বলেছেন। সুতরাং আল্লাহর নিকট পূর্বেই ইহা উত্তম বলে বিবেচিত ছিল। সমগ্র জাহানের সংখ্যা গরিষ্ঠ উম্মত মিলাদ ও কিয়াম করে আসছেন। সুতরাং ইহা যুগযুগের অনুসৃত প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ প্রথা। (সংগৃহীত-অনুবাদক)।

প্রশ্নঃ বিদআতে ছাইয়েআহ্ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উহা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তরঃ বিদআতে ছাইয়েআহ্ বলা হয় ঐ সব আকিদাও ও কাজকে- যা কোরআন- সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াহের নীতিমালার পরিপন্থী। ইহাই গোমরাহী ও জাহান্নামের পথ সুগম কারী। যেমন- খারেজী, শিয়া, মোতাজিলা, ওহাবী, মউদুদী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, বাহায়ী- ইত্যাদি ৭২ ফের্কর দল। আল্-হাদিকা ও মিরকাত গ্রন্থে ৭২টি বাতিল সম্প্রদায়কে বেদআতি ফের্কা এবং মূল ইসলামী দলকে ছুন্নী ফের্কা বলা হয়েছে। আমলের ক্ষেত্রে উক্ত বেদআতী কাজকে ফাছেকী এবং গুনাহর কাজ বলা হয় এবং আমলকারীকে বলা হয়

ফাছেক ও গুনাহ্গার। আর বেদআতী আকিদাকে বলা হয় প্রকৃত বিদআত এবং লোককে বলা হয় বিদআতী লোক- (ফতোয়া আল হারামাইন)।

বিদআতে ছাইয়েআহ্ নিষিদ্ধ

কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী বিদআতী আকিদা পোষন করা ও কাজ করা সম্পর্কেই নবী করিম (দঃ)-এর বিদআত সম্পর্কিত হাদীস গুলো প্রযোজ্য।

একটি হাদীস নিম্নরূপঃ

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ-

অর্থ : প্রত্যেক নূতন (খারাপ) সংযোজন বিদআত। প্রত্যেক (খারাপ) বিদআতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পথ হলো জাহান্নামের দিকে”।

ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস এবং বিদআতে হাসানা অধ্যায়ে বর্ণিত দুটি হাদীস পর্যালোচনা করে বলেছেনঃ প্রথম দুটি হাদীসে (مَنْ سَنَّ - مَا رَأَاهُ) উত্তম নূতন জিনিস আবিষ্কার ও সংযোজনের অনুমতি যেহেতু স্বয়ং নবী করিম (দঃ) দিয়েছেন এবং এটাই যুগ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ও প্রগতিশীল নির্দেশ। তাই তৃতীয় অত্র হাদীসে প্রত্যেক নূতন কাজকেই তিনি পুনরায় খারাপ বলে নিষেধ করতে পারেন না। তাই تَعَارُضٌ বা দ্বন্দ্ব- এর ক্ষেত্রে শেষোক্ত হাদীসকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে। এটাই ইল্মে হাদীসের নিয়ম। তাই ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেছেনঃ

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ (سَيِّئَةٌ) ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ-

অর্থ : ধর্ম প্রত্যেক নূতন সংযোজন বিদআত। ঐগুলির মধ্যে প্রত্যেক খারাপ বিদআতই হচ্ছে- গোমরাহী এবং গোমরাহীর পরিণাম-হচ্ছে- জাহান্নাম”। এই ব্যাখ্যাটি না করলে অপর দুটি হাদীস বাদ দিতে হয়। অথচ কোন হাদীসকে বাদ দেয়া জায়েয নেই। ওহাবী

ওহাবী আলেমেরা হাদীসের এই ব্যাখ্যাটি নিজেরা জানে- কিন্তু লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখাই তাদের স্বভাব।-অনুবাদক

বিদ্‌আতের প্রথম ৫ প্রকার কোরআন ও হাদীসের দ্বারাই অনুমোদিত হয়েছে এবং শেষোক্ত তিন প্রকার বিদ্‌আত- যথাঃ বিদ্‌আত তানজিহি, তাহরীমীও হারাম- এই তিন প্রকার বিদ্‌আত হাদীসের দ্বারাই নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব সকল বিদ্‌আতকে ঢালাও ভাবে খারাপ ও হারাম বলাটাই সবচেয়ে বড় বিদ্‌আত। বিদ্‌আত ৮ প্রকার। তন্মধ্যে ৫ প্রকার জায়েয এবং ৩ প্রকার নাজায়েয। -অনুবাদক

প্রশ্ন : আচ্ছা ! মিলাদ শরীফ পাঠ করা বা মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করার কোন ভিত্তি বা প্রমাণ হাদীস শরীফে আছে কিনা ? যদি থাকে, তাহলে তা কি ? এর মূল্যই কতখানি?

উত্তর : ফিলিস্তিনের বাসিন্দা এবং তৎকালীন জামেউল আযহারের ওস্তাদ এবং মিশরের তৎকালীন প্রধান বিচারক বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীর লেখক ইলমে হাদীসের গ্রন্থ উসদুল গাবা, তাহযিবুত তাহযীব ও নুখবাতুল ফিকার - এর প্রণেতা হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) (৭৭৪-৮৫০ হিজরী) গবেষণা করে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনের প্রমাণ স্বরূপ একটি ভিত্তি হাদীস শরীফ থেকে বের করেছেন- যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى فَصَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِصَوْمِهِ قَالَ

فَاسْتَفَادَ مِنْهُ فَعُلَ الشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ - وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ - وَآيُ نِعْمَةٍ أَعْظَمَ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ - مُلَخَّصًا - (فَتْحُ الْبَارِي)

অর্থঃ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) হাদীস বর্ণনা করেনঃ নবী করিম (দঃ) মদিনা শরীফে হিজরত করে যাওয়ার পর দেখলেন- ইহুদীরা আশুরার দিনে রোজা পালন করছে। নবী করিম (দঃ) এর কারন কি-তা জানতে চাইলেন। তারা বললো- এদিনেই আল্লাহ তায়াল্লা ফেরআউন বাহিনীকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং মুহা আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওমকে বাঁচিয়ে ছিলেন। সুতরাং ঐ ঘটনার শুকরিয়া স্বরূপ আমরা প্রত্যেক বৎসর এ দিনটি পালন করি এবং ঐদিনে রোজা রাখি। অতঃপর হুজুরও (দঃ) ঐদিনে রোজা রাখা শুরু করলেন এবং মুসলমানদেরও রোজা রাখতে উপদেশ দিলেন। -বোখারী

এ হাদীস বর্ণনা করার পর ইবনে হাজার আসকালানী বলেন- এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কোন দিনে আল্লাহ তায়াল্লা যদি কোন বিশেষ ইহুসান করেন এবং কোন নিয়ামত দান করেন অথবা কোন বিপদ দূর করেন, তাহলে ঐ নির্ধারিত তারিখে প্রতি বৎসর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর এই শুকরিয়ার কাজটি করা যেতে পারে বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন- নফল নামাজ, সদকা খয়রাত, নফল রোজা- ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন : রহমতের নবী- মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) দুনিয়াতে আগমনের চেয়ে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হতে পারে ? সুতরাং প্রতিবৎসর এ দিনে শুকরিয়া স্বরূপ মিলাদুন্নবী পালন করা নবীজীর সুনাতের দ্বারাই প্রমাণিত হলো- (ইবনে হাজার - এর ফতহুল বারী)।

মন্তব্য : ইবনে হাজার (রহঃ)-এর উক্ত গবেষণা মূলক ফতোয়াটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) নিজ ফতোয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন এবং মিলাদুন্নবীর মাহফিলকে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন। অথচ সেই বোখারী শরীফেরই এক জঘন্য ওস্তাদ খতীব

لَثَوِيْبَةٍ عِنْدَمَا بَشَّرْتَنِي بِوِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبَارِضَاعِهَا لَهُ-فَإِذَا كَانَ أَبُولَهَبُ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ
بِذَمِّهِ جُوْزَى فِي النَّارِ بِفَرْحَةٍ لَّيْلَةٍ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللهِ
الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ-(عَرَفُ التَّعْرِيفِ
بِالْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ)

অর্থঃ হাফেজ সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) “আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ” নামক আরবী গ্রন্থে বলেনঃ

“আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর (২য় হিজরী) তাঁকে স্বপ্নে দেখা গেল। (স্বপ্ন দর্শনকারী তার ভাই হযরত আব্বাস (রাঃ)। সাহাবীর স্বপ্নের কারণে এই স্বপ্ন বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে)। আবু লাহাবকে তার কবরের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। সে বললোঃ দোজখের শাস্তি ভোগ করছি। তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি কিছু লাঘব করা হয় এবং আমার অঙ্গুলীর মাথা হতে নিঃসৃত সামান্য পরিমাণ পানি চুষে পান করতে পাই। একথা বলেই সে অঙ্গুলীর মাথার দিকে ইশারা করে বললো “এই পুরস্কার এজন্য পাচ্ছি যে, নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম সংবাদ আমার কাছে নিয়ে এসেছিল আমার নিজ দাসী ছোয়াইবা। আমি তাকে খুশী হয়ে আজাদ করে দেই এবং আমার ভতিজাকে দুধ পান করানোর অনুমতি দান করি”।

মাওঃ ওবায়দুল হক বলেছে, সে নাকি মিলাদুন্নবীর প্রমাণ কোথাও পায়নি। (নাউজু বিল্লাহ) ইমাম সুয়ুতি (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, এতে প্রমানিত হলো- মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করা এবং দলে দলে তাতে যোগদান করা ও সমাবেশ করা- উত্তম নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত। ইহা ইবাদতের মধ্যে গন্য। কেননা, এতে নবী করিম (দঃ)-এর ধরাধামে আগমনের দিনকে চির স্মরণীয় করে রাখা হয় এবং খোদার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় করা হয়। এ উদ্দেশ্যে এ উপলক্ষ্যে খানাপিনার আয়োজন করা, নফল নামাজ পড়া, বন্ধু বান্ধবকে উপহার প্রদান করা, কুশল বিনিময় করা এবং অন্যান্য নৈকট্য মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে খুশী ও আনন্দ উদ্‌যাপন করা- খোদার নেয়ামতেরই শুকরিয়া আদায় করার শামিল। - জালালুদ্দীন সুয়ুতি

উলামায়ে কেরাম মিরআতুজ জামান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেঃ

عَمَلُ الْمَوْلُودِ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ لِنَيْلِ الْبُغْيَةِ
وَالْمَرَامِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-

অর্থঃ “মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করলে এই আমলের দ্বারা এক বৎসর পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং মাক্সুদ ও উচ্চ বাসনা শীঘ্র পূরণের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। নিয়ত পরিমানেই বরকত লাভ হয়” (মিরআতুজজামান)

ইমাম হাফেজ সামছুদ্দীন ইবনুল জাজরী (রহঃ) স্বীয় আরবী গ্রন্থ “আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ” গ্রন্থে নিজ ভাষায় লিখেছেনঃ

قَدَرُؤِيْ أَبُولَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا حَالُكَ فَقَالَ
فِي النَّارِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِّي كُلَّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ وَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ
إِصْبَعَيْ مَاءٍ بِقَدْرِ هَذَا وَأَشَارَ لِرَأْسِ إِصْبَعِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِيْ

ইমাম সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) বলেনঃ “আবু লাহাব ছিল কাফের এবং তার বিরুদ্ধে সুরা লাহাব নাজিল হয়েছিল। সে জাহান্নামের আযাবে লিপ্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহর জন্য সংবাদে খুশী হওয়ার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও সে প্রতি সোমবার এই পুরস্কার পাচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে। তাহলে যেই তৌহিদপন্থী মুসলমান নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে খুশী উদযাপন করবে এবং নবী করিম (দঃ)-এর মহব্বতে সাধ্য পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করবে- তার অবস্থা ও পরিনতি কি হতে পারে? আমার জীন্দগীর কসম করে বলছি- আল্লাহর পক্ষ হতে এর পুরস্কার ও প্রতিদান হবে এই যে, -আল্লাহ দয়া করে তাকে জান্নাতুন নায়ীম নামক বেহেস্তে স্থান দেবেন”। (আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ শরীফ)

বিঃ দ্রঃ পূর্ব যুগের চারখানা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত উপরে বর্ণনা করে মিলাদুন্নবী প্রমাণ করা হলো। বাংলাদেশের কিছু আলেম বেহেস্তী জেওর ও ফতোয়ায় রশিদিয়া নামক উরদু কিতাব দ্বারা মিলাদ ও কিয়াম করাকে শিরক, হারাম, কৃষ্ণলীলার গান-ইত্যাদি বলে থাকে। চারজন জগত বিখ্যাত ইমামের তুলনায় এসব পুচকি মৌলভীর কি মূল্য আছে? “মিলাদ ও কিয়ামের” বিস্তারিত দলীল প্রমাণের জন্য আমার রচিত ‘মিলাদও কিয়ামের বিধান’ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করুন। উহা উলামাদের জন্য খুবই উপকারী কিতাব। (অনুবাদক)

ষোড়শ অধ্যায়

জলী যিকির ও হালুকায়ে যিকির প্রসঙ্গ

(الذِّكْرُ بِالْجَهْرِ وَالْاجْتِمَاعُ لَهُ)

প্রশ্নঃ যিকির ও তরিকতের অন্যান্য মাহফিল করা কি? আজকাল প্রায়ই এরূপ সমাবেশ করতে দেখা যায়। শরীয়তে এর কতটুকু অনুমতি আছে?

উত্তরঃ যিকির ও তরিকতের অন্যান্য মাহফিল করা সুন্নাহ। এটা করা উত্তম এবং মোস্তাহাব সাওয়াব। কিন্তু শর্ত হলো- হারাম বা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ সেখানে হতে পারবেনা। যেমনঃ বেগানা মেয়ে পুরুষের একসাথে অবস্থান ও উঠা বসা। পৃথক ব্যবস্থা থাকলে এবং মুহরিম পুরুষের সাথে গেলে জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ উচ্চস্বরে যিকির- আযকার সহকারে উক্ত মাহফিল করার কোন দলীল আছে কি?

উত্তরঃ একত্রিত হয়ে উচ্চ স্বরে যিকির- আযকার করার ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস আছে। যথাঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ- (رواه مُسْلِمٌ)

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কোন কওম আল্লাহ তায়ালায় যিকিরের

মাহ্ফিলে বসলে রহমতের ফেরেস্তারা তাঁদেরকে বেঁটন করে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাঁদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর- তাঁদের কথা আল্লাহ্ তায়াল্লা আপন ফেরেস্তাদের কাছে গর্বের সাথে আলোচনা করেন”-মুসলিম শরীফ।

وَاٰخَرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۲۱
خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا يَجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا جَلَسْنَا
نَذْكُرُ اللهَ وَنُحَمِّدُهُ فَقَالَ اِنَّهُ اَتَانِي جِبْرِيلُ فَاخْبَرَنِي اَنَّ اللهَ
يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ-

অর্থ : “ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- নবী করিম (দঃ) আপন সাহাবীগনের কোন এক হাল্কা উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদেরকে এখানে কিসে বসিয়েছে? সাহাবীগন উত্তর দিলেন- আমরা বসেছি আল্লাহর যিকিরের জন্য এবং তাঁর প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে। হুজুর পুরনুর (দঃ) বললেনঃ এইমাত্র জিব্রাইল (আঃ) আমাকে এসে খবর দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিয়ে গৌরব করছেন আপন ফেরেস্তাদের কাছে।” এখানে যিকির অর্থ মৌখিক যিকির - (মুসলিম ও তিরমিজি)

وَاٰخَرَجَ اَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ مَرْفُوعًا مَّا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا ۩
يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالٰى لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْاَوْجَهَ اللهَ اِلَّا نَادَاهُمْ
مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَّكُمْ- قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ
حَسَنَاتٍ-(اَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ)

অর্থ : ইমাম আহমদ ও তাব্রানী (রহঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- যদি কোন কওম আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহলে আসমান থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন- “যাও! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং তোমাদের কৃত গুনাহ্ গুলো (আল্লাহর হক) নেক-এর দ্বারা পরিবর্তন করা হলো।” সুব্হানাল্লাহ! (আহমদ ও তাব্রানী)।

উপরে উল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমানিত হলো যে, যিকির - ফিকির ও ভাল কাজের জন্য একত্রিত হয়ে বসা ও হালকা করা উত্তম। আল্লাহ্ তায়াল্লা এসব বান্দাদের জন্য আপন ফেরেস্তাদের কাছে গৌরব করে থাকেন।

৪। উচ্চস্বরে যিকির করা :

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) কর্তৃক নবী করিম (দঃ) বর্ণিত একখানা হাদীসে কুদসী বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ
عَبْدِي بِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ- فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ
فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍّ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاٍّ خَيْرٍ مِّنْهُ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ তায়াল্লা বলেছেন-“ আমার সম্পর্কে বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আমি তার সাথে আচরণ করবো। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি (সাহায্য নিয়ে)। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনেই স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে বসে (উচ্চস্বরে) স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে স্মরণ করি- এর চেয়েও উত্তম মজলিসে”। (বোখারী শরীফ-হযরত আবু হোরায়ারা সূত্রে)

লক্ষ্য হতে পারে যে, হাদীসে তো মজলিসে বসে যিকিরের কথা বলা হয়েছে- উচ্চস্বরে কোথায় পেলেন? জওয়াব হচ্ছে- মজলিসে একত্রে বসে যিকির করার অর্থই হচ্ছে- জোরে জোরে যিকির করা।

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا : أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُنَّا- ٥١
- فَقُونِ إِنْكُمْ مَرَأُونَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ-

“ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ তোমরা বেশীবেশী করে আল্লাহর যিকির করো- যেন মোনাফিকরা একথা বলে যে- তোমরা লোক দেখানো যিকির করছো। অন্য রেওয়াযাতে আছেঃ মোনাফিকরা বলে- তোমরা পাগল হয়ে গেছো”।

একথা সবারই জানা যে, জলী যিকিরের দ্বারাই মোনাফিকরা বুঝতে পারে যে, এলোক গুলো লোক দেখানো যিকির করছে অথবা পাগল হয়ে গেছে। চুপে চুপে যিকির করলে সামালোচনার কোন সুযোগই তারা পেতনা। এতে বুঝা গেল- যারা যিকিরে জলীকে অস্বীকার করে -তরাই মোনাফিক টাইপের লোক।

(ফায়দা) : তরিকত পন্থী বিশেষজ্ঞ উলামা ও সুফী সাধকগণ বলেছেন যে- যিকিরে জলী ও যিকিরে খফী- উভয় প্রকারেরই বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যিকিরকারীর অবস্থা ভেদে যিকিরে জলী ও যিকিরে খফীর হুকুমও বিভিন্ন হবে। ইহাই উভয় প্রকারের হাদিসের উপর আমল করার উত্তম পন্থা। পাত্রভেদে ব্যবস্থা। যিকিরকারীর কলবের জন্য উপযোগী এবং তার মনোযোগ স্থির করার জন্য যে যিকির উপযুক্ত বলে আপন শায়খ বিবেচনা করবেন- তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা পত্রই দেবেন। সুফী সাধক উলামায়ে কেরাম আরও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জলী যিকিরকে নিজের রিয়া বা অন্যের নামায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারন বলে আশংকা করে- তার জন্য যিকিরে খফীর ব্যবস্থাপত্র দেয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি এসব ধারণা থেকে ও আশংকা থেকে মুক্ত হবেন- তার জন্য যিকিরে জলীর ব্যবস্থা পত্র দেয়াই শ্রেয়। কেননা, যিকিরে জলীর মধ্যে অনেকের আমল একসাথে যোগ হয়ে বেশী হয় এবং একজনের হাল অন্যজনের মধ্যে তাহির পয়দা করে। এই সম্মিলিত যিকিরে জলী কলবের মধ্যে আছর

করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উপযোগী এবং কলবের মনোযোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ যেতে পারেনা। মানুষ যে রকম উদ্দেশ্য করে-তার ফলাফলও সেরকমই হয়। আল্লাহ- সর্বজ্ঞ এবং তিনিই মানুষের গোপন বিষয়ে একমাত্র অন্তর্যামী- **وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ**

বিঃ দ্রঃ হাল্কায়ে যিকির ও যিকিরের মাহফিলের বিরুদ্ধে এক দল লোক উঠে পড়ে লেগেছে। এরা শুধু ইসলামী হুকুমতের জন্য লড়াই করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলছে। ফলে মুসলমান সুফীদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে রেখেছে। এজন্যই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের অবতারণা। বিস্তারিত তাসাউফের কিতাবে দেখুন। - অনুবাদক

সপ্তদশ অধ্যায়

আহ্লে বাইত-এর মহব্বৎ প্রসঙ্গে

(الْحِثُّ عَلَى مُحَبَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ)

প্রশ্ন : নবী করিম (দঃ)-এর পরিবার পরিজনের প্রতি মহব্বৎ পোষন করা কি ঈমানের অঙ্গ ?

উত্তর : হাঁ! নবী করিম (দঃ)-এর পরিবার পরিজন ও আহ্লে বাইত-এর প্রতি মহব্বৎ পোষন করা সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর ফরজ। কোরআন মজিদের আয়াত ও নবী করিম (দঃ)-এর হাদীস দ্বারা এই ফরজ প্রমাণিত। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল (দঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর আহ্লে বাইত-এর প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসা পোষন ও প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়েয়ীন ও আইম্মায়ে সল্ফে সালেহীনগন এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে গেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদের সূরা শুরা এর-২৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَا سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

অর্থঃ “হে রাসুল ! আপনি বলে দিন -আমি আমার দাওয়াতের কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। চাই শুধু আমার পরিবার পরিজনদের প্রতি তোমাদের মহব্বৎ ও সৌহার্দ।”

ইমাম আহমদ, তাবরানী ও হাকিম- তিনজন মোহাদ্দেছ নিম্নের হাদীস খানা উক্ত আয়াতের তাফসীর স্বরূপ বর্ণনা করেছেনঃ

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ

الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَتْ -عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا-

অর্থ : “যখন কোরআনের উক্ত পবিত্র আয়াতটি নাজিল হলো -তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরজ করলেন- ইয়া রাসুল্লাহ! আপনার যেসব আপনজনের প্রতি মহব্বৎ পোষন করা এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে- উনারা কে? নবী করিম (দঃ) বললেনঃ “আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের দুই পুত্র।” (ইমাম আহমদ তাবরানী ও হাকিম)।

তাবয়েয়ী সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) “আপনজনের” ব্যাখ্যায় বলেনঃ নবী করিম (দঃ) আমার আত্মীয়। এখানে হুজুর (দঃ)-এর ভায়রার ছেলে সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে আপনজন বা কোরবা বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا قَالَ الْحَسَنَةُ مَوَدَّةُ آلِ مُحَمَّدٍ

অর্থ : “যে ব্যক্তি উত্তম জিনিসের স্বীকৃতি দিবে, আমি তাতে তাকে উত্তম জিনিস বৃদ্ধি করে দেবো।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : উক্ত আয়াতে প্রথম حَسَنَةُ শব্দ দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরের মহব্বৎকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরের মহব্বৎ উত্তম পুরস্কার দ্বিগুন প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।

এই গেল আয়াতের ব্যাখ্যা। এবার হাদীসে আসা যাক।

১। ইবনে মাজা শরীফে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَالُ أَقْوَامٍ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

مَا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِئٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمُ اللَّهُ وَلِقَرَابَتِي-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ লোকদের কি হলো যে, যখন আমার কোন আহ্লে বাইত তাদের মজলিসে বসে, তখন তারা এদের সাথে কথা বন্ধ করে দেয়। যার হাতে আমার প্রান- সেই মহান সত্ত্বার শপথ করে বলছি- যে পর্যন্ত আমার আহ্লে বাইতকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভাল না বাসবে- সে পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কলবে ঈমান প্রবেশ করবেনা”।

২। অন্য বর্ণনায় আছেঃ

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِي حَتَّى يُحِبَّنِي وَلَا يُحِبَّنِي حَتَّى يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِي

অর্থঃ “কোন বান্দা আমার ব্যাপারে পূর্ণ মোমেন হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না সে আমাকে ভালবাসবে; এবং সে আমাকেও ভালবাসেনা- যে পর্যন্ত না সে আমার আহ্লে বাইতকে ভালবাসবে।”

৩। ইমাম তিরমিজি ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ وَأَحِبُّوا لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহকে ভালবাসো। কেননা, তিনি তোমাদেরকে নেয়ামতের দ্বারা খাদ্য সরবরাহ করছেন। এবং আমাকে ভালবাসো- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার আহ্লে বাইতকে ভালবাসো- আমার মহব্বতের উদ্দেশ্যে”।

৪। দায়লামী শরীফে আছেঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ

خَصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তানাদিকে তিনটি বিষয়ের আদব শিক্ষা দিও- (১) তোমাদের নবীর প্রতি ভালবাসা, (২) তাঁর আহ্লে বাইতের প্রতি ভালবাসা, (৩) কোরআন তিলওয়াতের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ”।

৫। ইমাম তাবরানী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

أَخْرَمَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْلَفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) সর্বশেষ যে বানী সমূহ প্রদান করেছেন- তার মধ্যে একটি হচ্ছে- তোমরা কি আমার আহ্লে বাইতের ব্যাপারে আমাকে প্রতিনিধি করবে।”

৬। ইমাম তাবরানী ও আবুশ শায়খ হাদীস বর্ণনা করেনঃ

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثَ حُرْمَاتٍ فَمَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللَّهُ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ دِينَهُ وَلَا دُنْيَاهُ قِيلَ مَا هُنَّ قَالَ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ وَحُرْمَتِي وَحُرْمَةُ رَحْمَتِي-

অর্থঃ “নবী (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিসের মর্যাদা রয়েছে। যারা ঐ তিনটি মর্যাদার হেফাজত করবে- আল্লাহ তায়ালাও তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার হেফাজত করবেন। আর যারা উক্ত তিনটি বিষয়ের মর্যাদা রক্ষা করবেনা- আল্লাহও তাদের দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে হেফাজত করবেন না। প্রশ্ন করা হলো- ঐ তিনটি জিনিস কি? নবী করিম (দঃ) বললেন- (১) ইসলামের মর্যাদা (২) আমার মর্যাদা ও (৩) আমার মহব্বতের মর্যাদা”।

৭। ইমাম বায়হাকী ও ইমাম দায়লামী হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَتَكُونَ عِثْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِثْرَتِهِ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- কোন বান্দা ঈমানদার হতে পারবেনা- যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার আপন প্রাণ হতে অধিক প্রিয় না হবো এবং আমার বংশধর তার বংশধরের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে এবং আমার আহলে বাইত তার আহলে বাইতের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে।”

৮। ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ বোখারীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ فَلَا تُؤْذُوهُمْ-

অর্থ : “হে লোক সকল ! তোমরা হযরতের আহলে বাইত- এর ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে সতর্ক থাকিও এবং তাঁদের ব্যাপারে হুজুর (দঃ)-এর মর্যাদা রক্ষা করো। অতএব তাঁদেরকে কষ্ট দিওনা।”

৯। আবুবকর (রাঃ) আরও বলেনঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي-

অর্থ : “যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ - নবী করিম(দঃ) এর আত্মীয় স্বজনের হক আমার আত্মীয় স্বজনের হকের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয়।”

শিয়াগণ বলে- হযরত আবুবকর (রাঃ) নাকি বিবি ফাতেমার (রাঃ) হক নষ্ট করেছেন।

১০। কাজী আয়াজ (রাঃ)-এর শেফা শরীফে উল্লেখ আছে- নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْوَلَايَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন : মোহাম্মদ (দঃ)- এর বংশধরের পরিচিতি জানা দোজখ থেকে নিষ্কৃতির উপায়, মোহাম্মদ (দঃ) -এর বংশধরের মহববৎ রাখা পুলসিরাত অতিক্রমের উপায় এবং মোহাম্মদ (দঃ) এর বংশধরের বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া আযাব থেকে নিরাপত্তার উপায়।”

হে আল্লাহ! আহলে বাইতের সঠিক পরিচিতি, সঠিক মহববৎ ও তাঁদের বেলায়াত বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়ার তৌফিক দান কর! আমিন!!

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ -

অর্থ “আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়” - (সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)

হাদীস :

১। নবী করিম (দঃ) মিথ্যারে দাঁড়িয়ে এরশাদ করেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَبْرِ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُؤْذُونَنِي فِي نَسَبِي وَذَوِي رَحِمِي إِلَّا مَنْ أَذَى نَسَبِي وَذَوِي رَحِمِي فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ تَعَالَى -
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

অর্থঃ “মিথ্যারে দাঁড়িয়ে নবী করিম (দঃ) এই সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেনঃ ঐ কণ্ঠের কি হলো যে, তারা আমার বংশধর এবং আমার নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়। সতর্ক হয়ে যাও! যারা আমার বংশধর ও নিকটাত্মীয়দেরকে কষ্ট দেয়- তারা আমাকেই কষ্ট দেয় এবং যারা আমাকে কষ্ট দেয়- তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কষ্ট দেয়”। (তাবরানী ও বায়হাকী!)

২। তিরমিজি, ইবনে মাজাও হাকিমে বর্ণিত আছেঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي عَلَى وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلَامٌ لِمَنْ

অষ্টাদশ অধ্যায়

আহ্লে বাইত-এর প্রতি বিদ্বৈষ পোষণের পরিণতি প্রসঙ্গেঃ

(التَّحْذِيرُ مِنْ بُغْضِهِمْ)

প্রশ্ন : “নবী করিম (দঃ)-এর বংশধরগণের প্রতি বিদ্বৈষ মনোভাব পোষণ করা বা তাঁদেরকে কষ্ট প্রদান করার বিরুদ্ধে কোন হুশিয়ারী- কোরআন ও হাদীসে আছে কিনা?

উত্তরঃ হাঁ! কোরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক সতর্কবানী এসেছে। আওলাদে রাসুলগণের প্রতি বিদ্বৈষ মনোভাব পোষণ করা থেকে বিরত থাকা ধর্মপ্রান প্রত্যেক মুসল-মানের অবশ্য কর্তব্য। কেননা, এটা ধর্ম ও আখিরাতে ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। এর দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর মনে আঘাত দেয়া হয় এবং নবীজির দরবারে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। দ্বীনের উলামায়ে কেরামগন এ মর্মে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- যে ব্যক্তি আহ্লে বাইতকে কষ্ট দেয়, সে প্রকৃত পক্ষে নবী করিম (দঃ-) কেই কষ্ট দেয়, এবং এই কষ্ট শেষ পর্যন্ত খোদাকেই দেয়া হয়। এর দ্বারা একজন মুসলমান লানতের ও শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়। নবী করিম (দঃ) কে কষ্ট দেয়ার যে পরিনতির কথা কোরআন মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে- সে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ তায়াল্লা কোরআনুল করিমে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا -

অর্থঃ “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়- আল্লাহ তায়াল্লা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানতের অধিকারী করে দেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর হীন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন” (সূরা আহযাব ৫৭ আয়াত)

৫। দায়লামী শরীফে আছেঃ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ مِنْ اِذَا نِي فِي عِثْرَتِي-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর শক্ত গজব নাজিল হবে- যে ব্যক্তি আমার বংশধরদের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়” (দায়লামী)

হে আল্লাহ্ ! তোমার প্রিয় হাবীরের সমস্ত বংশধর ও আহলে বাইত-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তোমার লানত, গজব ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করো! আমিন!!

سَلَّمَهُمْ-(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ)

অর্থ “নবী করিম (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ আনহুম) সম্পর্কে বলেছেনঃ যারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করে আমি ও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো এবং যারা তাঁদের সাথে শান্তি স্থাপন করে- আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবো”। (তিরমিজি ইবনে মাজা ও মোস্তাদরাকে হাকিম)

৩। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) তাঁর সিরাত গ্রন্থে নবী করিম (দঃ)-এর মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

لَا يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْآمِنِينَ تَقِيٍّ وَلَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ-

অর্থঃ “আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে মোমেন মোত্তাকীরাই আমার সাথে মহববৎ রাখে এবং হতভাগা মোনাফিকরাই বিদ্বেষ পোষন করে”-(মোল্লা আলী ক্বারীর সিরাত গ্রন্থ)।

৪। তাবরানী ও হাকিম হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّارَ-

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে খানায় কাবার হাজুরে আসওয়াদ ও মকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী পবিত্র স্থানে আবদ্ধ রেখে সর্বদা নামাজ রোজা পালন করতে থাকে- আর মোহাম্মদ (দঃ)-এর আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা অবস্থায় মারা যায়- তবুও সে জাহান্নামে যাবে”। (তাবরানী ও মোস্তাদরাকে হাকিম)

উনবিংশ অধ্যায়

নবী করিম (দঃ)-এর আহ্লে বাইত-এর ফজিলত প্রসঙ্গে

(فَضَائِلُ أَهْلِ الْبَيْتِ)

প্রশ্ন : হযরত রাসুল করিম (দঃ)-এর বংশধরের পরিচয় এবং তাঁদের ফজিলত সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তরঃ জানা দরকার -নবী করিম (দঃ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যে উচ্চ গৌরব ও মর্যাদার নিদর্শন বিদ্যমান। যে কোন আকলমন্দ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন। হুজুর পুরনুর (দঃ)-এর পূর্ব পুরুষও অধঃস্তন বংশধরগনই সবচেয়ে মর্যাদাবান খান্দান। কেননা, তাঁদের বংশের সম্পর্ক হচ্ছে নবী করিম (দঃ) এর সাথে এবং তাঁদের মর্যাদার সম্পর্কও হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর মর্যাদার সাথে। ওলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সাইয়েদগন পিতৃকূল ও মাতৃকূলের দিক দিয়ে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। তবে শরীয়তের আইনের ক্ষেত্রে এবং অপরাধ আইনের ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যান্য মানুষের সমান।

কোরআন এবং হাদীসে তাঁদের ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মাতৃকূলের (ফাতেমা) মাধ্যমে তাঁদের বংশীয় পরিচিতি শুদ্ধ। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় পিতৃকূলের মাধ্যমেই পরিচিতি হয়ে থাকে। মাতৃকূলের মাধ্যমে (বিবি ফাতেমা) তাঁদের আহ্লে বাইত ভুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহু তায়ালায় কালাম। আল্লাহু তায়ালা এরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

অর্থ : “হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহু ইচ্ছা করেন তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে” (সূরা আহ্‌যাব ৩৩ আয়াত)

উলামায়ে কেরাম এবং তাফসীর বিশেষজ্ঞগন বলেছেন যে- উক্ত আয়াতে দুই প্রকারের আহ্লে বাইতকেই शामिल করা হয়েছে। প্রথম প্রকার হলো- বৈবাহিক সূত্রে আহ্লে বাইত- অর্থাৎ উম্মাহাতুল মোমিনিগণ। দ্বিতীয় প্রকার হলো- বংশগত সূত্রে আহ্লে বাইত- অর্থাৎ বিবি ফাতেমা, হযরত আলী ও ইমাম হাসান- হোসাইন এবং তাঁদের বংশধরগন। অন্যান্য সাহেবজাদীগনও আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। এটাই বিস্তৃত মত এবং আয়াতের পূর্ব সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বংশগত আহ্লে বাইতের মর্যাদা অনেক উর্দে। শিয়াগন উম্মাহাতুল মোমিনীন ও অন্যান্য সাহেবজাদীগনকে আহ্লে বাইত বলে স্বীকারই করেনা। এখানেই শিয়া- সুন্নীর পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব।

বহু হাদীসে নবী করিম (দঃ)-এর চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই জাফর ও আকিল (রাঃ)- এর বংশধরগনকেও তিনি আহ্লে বাইত বলেছেন। তবে হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ্লে বাইত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁদের মর্যাদা সকলের উর্দে। অন্যান্যরা গৌন। সুতরাং, উভয় হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ)

অর্থ : “আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ কোরআন মজিদের সূরা আহ্‌যাবের ৩৩ নম্বর আয়াতটি ৫ জনের শানে নাজিল হয়েছে -নবী করিম (দঃ), হযরত আলী, বিবি ফাতেমা ও ইমাম হাসান হোসাইন”। (একজন হলেন ঘরের মালিক, বাকী চারজন হলেন পরিবারের সদস্য)। এতে বুঝা যায় উক্ত ৫ জনের জন্যই আয়াতটি খাস।

সহীহ রেওয়াতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلَى هَؤُلَاءِ كَسَاءً وَقَالَ

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي إِذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً وَفِي رِوَايَةٍ أَلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَوَضَعَ يَدَهُ
عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَلِ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ
وَبَرَكَاتِكَ عَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এই আয়াত (মদিনায়) নাজিল হওয়ার পর উক্ত চারজনের উপর একখানা চাদর রেখে এভাবে দোয়া করলেন-“হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বাইত এবং আমার খাস বংশীয়। তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূর করো এবং তাঁদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করো।” অন্য রেওয়ায়াতে আছে- একখানা চাদর তাঁদের উপর নিক্ষেপ করে এবং তাঁদের উপর হাত রেখে বললেনঃ “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এরা আমি মুহাম্মদ (দঃ) এর বংশধর। তুমি মুহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরদের উপর তোমার রহমত ও বরকত সমূহ দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী”।

মন্তব্যঃ উপরের দুটি হাদীসে উক্ত চারজনকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অন্যদেরকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। এজন্যই এ চারজনকে “আহ্লে রেদা”, “আহ্লে আব্বা” ও “আহ্লে কাছা” বলা হয় এবং নবী করিম সহ পাঁচজনকে পাক পাঞ্জাতন বলা হয়। পারশ্য দেশে এভাবেই উনাদের পরিচিতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। -অনুবাদক

ফয়সালা : ইবনে জরীর ও ইবনে আব্বি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইকরামা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন- কোরআনের আয়াতে ‘আহ্লে বাইতে’র মধ্যে উম্মাহাতুল মোমেনীনগণ এবং হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে চাদর দ্বারা আবৃত করার মাধ্যমে ৪ জনের আলাদা উচ্চ মর্যাদা ও পৃথক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। (ইবনে জরীর ও কানযুল ঈমান)। -অনুবাদক

কোরআন মজিদে আহ্লে বাইতের আর একটি মর্যাদা সুরা আলে এমরানের ৬১ নম্বর আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ-

অর্থ : “হে রাসুল! (ইছা আলাইহিস সালাম পিতাবিহীন জন্ম সম্পর্কে) আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার কাছে সঠিক ও সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পরও যদি কেউ আপনার সাথে বিবাদ করে- তাহলে বলুন! তোমরা (খৃষ্টান পণ্ডিত) এসো! আমরা আমাদের পুত্রদেরকে তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে, আমরা আমাদের স্ত্রীগণকে তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে এনে একত্রিত করে- মোবাহালা করি। তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর সম্মিলিতভাবে আল্লাহর লানত কামনা করতে থাকি।” (সুরা আলে ইমরান ৬১ আয়াত) মোবাহালা অর্থ- পরস্পরের উপর লানত বর্ষনের জন্য সম্মিলিত প্রার্থনা করা।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নাজরানের খৃষ্টান পণ্ডিতদের সাথে নবী করিম (দঃ) কর্তৃক মোবাহালার চ্যালেঞ্জ-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং মোবাহালার নিয়মও বলে দিয়েছেন। তা হলো- উভয় পক্ষ নিজ নিজ ছেলে সন্তান, স্ত্রী ও নিজেরা একত্রিত হয়ে মিথ্যা দাবীদারদের উপর আল্লাহর লানত কামনা করা। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোন বিষয়ের গীমাংসা না হলেই এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ খৃষ্টানরা দাবী করেছিল যে- ইছা (আঃ) উপাস্য ভগবান এবং নবী করিম (দঃ) দাবী করেছিলেন যে- তিনি উপাস্য ভগবান নন বরং তিনি আল্লাহর একজন উপাসনাকারী বান্দা ও রাসুল। নবীজীর যুক্তি মানতে তারা নারাজ ছিল। তাই এই চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ। নবী করিম (দঃ) কথামত হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ আনহুম) কে ডেকে আনলেন। তিনি ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কোলে নিয়ে, ইমাম হাসান (রাঃ) কে হাত ধরে আগে আগে চললেন। বিবি ফাতেমা (রাঃ) নবীজীর পিছনে পিছনে এবং হযরত আলী (রাঃ) সর্ব পিছনে চললেন। নবী করিম (দঃ) বললেন- “হে আল্লাহ! এরা আমার খাস বংশধর”।

এ আয়াতে স্পষ্ট প্রমানিত হলো যে- ইমাম হাসান-হোসাইন ও বিবি ফাতেমা (রাঃ) হুজুরের অন্যতম আহলে বাইত। দুনিয়া ও আখেরাতে উনাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং ক্ষতিও হয়- যদি তাঁরা বদদোয়া করেন। যেমন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাঁরা বদদোয়া করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন- যদিও মোবাহলা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি।

উনাদেরকে 'আহলে বাইত' বলে কেউ কেউ অস্বীকার করে। যেমনঃ বাদশাহ হারুনুর রশিদ একবার ইমাম মুছা কাজেমকে (রাঃ)-যিনি বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর ৫ম অধস্তন বংশধর ছিলেন, প্রশ্ন করলেন- “আপনারা তো হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। কিভাবে আপনারা বলেন- আমরা নবীজীর আওলাদ? কোন ব্যক্তি তো পিতার মাধ্যমেই দাদার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পরিচিত হয়। মায়ের মাধ্যমে নানার সাথে নয়”। অপর দিকে বাদশাহ হারুনুর রশিদ ছিলেন হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর। সুতরাং পিতৃপুরুষের মাধ্যমে আব্বাসীয়গণ নবী করিম (দঃ)-এর সাথে বংশীয় ভাবে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাদশাহর এই খোঁচানীমূলক উক্তি শুনে ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ) আউজু বিল্লাহ- বিস্মিল্লাহ বলে কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াত খানা তিলাওয়াত করে প্রমান করলেন যে- মাতৃকুলের মাধ্যমেও পরিচিতি হতে পারে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইছা (আঃ)-এর বংশ পরিচয় এভাবে দিয়েছেন :

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ-وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ-وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ-

অর্থঃ “হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণের মধ্যে আমি নবুয়ত দান করেছি- দাউদ, সোলায়মান, ইউসুফ, মুছা ও হারুন (আঃ) কে। একরূপেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর নবুয়ত ও হেদায়াত দান করেছি- যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, ইছা ও ইলিয়াস (আঃ) কে”। (সূরা আনআম ৮৫ আয়াত)

হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ) বললেন : “দেখুন বাদশাহ! ইছা (আঃ)-এর তো পিতা নেই, শুধু মা আছেন। তবুও তাঁকে নবীগণের বংশধর বলা হয়েছে- শুধু মাতৃকুলের মাধ্যমে। তদ্রূপ- আমরাও আমাদের পূর্বতন মাতা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাধ্যমেই নবী করিম (দঃ)-এর বংশধর সাব্যস্ত হয়েছি। সুতরাং আপনার খোঁচা দেয়া ঠিক হয়নি”।

মুহাম্মাদুল্লাহ! একেই বলে নবী খান্দানের শরাফত। তিনি আরও বললেনঃ “হে বাদশাহ। মোবাহলার আয়াতে শুধু স্ত্রী ও পুত্র বা ছেলেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নবী করিম (দঃ) হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান - হোসাইন কাউকেই বাদ দেননি- বরং সকলকে বংশধর হিসাবে এবং হাসান হোসাইনকে পুত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন (মাজমাউল আহাবাব)”।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আলে আব্বাস ও আলে ফাতেমার মধ্যে নবী বংশ নিয়ে মতলার্থ্য্য ছিল। আব্বাসীয়রা মনে করতো- তাঁরাই আহলে রাসুল- তথা আহলে বাইত। বনু ফাতেমা বা ফাতেমীয়রা সঙ্গত কারনেই বিশ্বাস করতো যে- তাঁরাই নবীজীর প্রকৃত বংশধর। তাই এই ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। -অনুবাদক

আহলে বাইত-এর ফজিলত প্রসঙ্গে যেসব হাদীস এসেছে তার সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েক খানা উল্লেখ করা হলো।

১। আবু ইয়ালা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُودُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنْ الْإِخْتِلَافِ-

অর্থঃ “সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন- নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আকাশবাসীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো তারকা রাজি (এগুলো দিয়ে তারা শয়তানকে ভাঙায়) আর আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো আমার বংশধরগণ”। (ইখতিলাফ থেকে বাঁচবার উত্তম ব্যবস্থা) -আবু ইয়ালা।

২। ইমাম আহমদ-এর বর্ণনায় নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ

فَإِذَا أَهْلُكَ أَهْلُ بَيْتِي جَاءَ أَهْلُ الْأَرْضِ مِنَ الْآيَاتِ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ-

অর্থ : “আমার বংশধরগনকে ধংস করার পর জমিন বাসীদের জন্য এমন সব গজবের নিদর্শন আসবে- যা তাদের জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুত ছিল”। (ইমাম আহমদ)

৩। মোস্তাদরাক হাকিম বর্ণনা করেনঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ وَلِيَّ بِالْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ-

অর্থ : “হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন-নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমার সাথে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে এই ওয়াদা করেছেন যে- তাঁদের মধ্যে যারা আল্লাহর তাওহীদের উপর সাক্ষ্য দেবে এবং আমার দাওয়াত কাজের সাক্ষ্য দেবে- আল্লাহ্ তাঁদেরকে কোন শাস্তি দেবেন না”। - (মোস্তাদরাক হাকিম)

নোট : আল্লাহ্ ও রাসুলের তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার উপরই আহলে বাইতের নাজাত নির্ভরশীল। শুধু বংশগত কারণে নয়।

৪। ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেনঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخِرِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস

রেখে যাচ্ছি- যাকে মজবুত করে ধরে রাখলে তোমরা আমার পরে কখনও গোমরাহ্ হবেনা। একটি আর একটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো- আল্লাহর কিতাব- যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর অন্যটি হচ্ছে- আমার আত্মীয় স্বজন আহলে বাইত। এ দুটি জিনিস পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে আমার নিকট হাওজে কাউছারে গিয়ে পৌছবে। অর্থাৎ সে পর্যন্ত উভয়টিই তোমাদের হেদায়াতের কাজে আসবে। এখন দেখ! এদুটোর ব্যাপারে তোমরা কিরূপে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে?” - (তিরমিজি)।

৫। সহীহ বর্ণনায় এসেছেঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَفِي رِوَايَةٍ هَلَكَ وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابٍ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- তোমাদের মাঝে আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হলো নূহ নবীর (আঃ) কিস্তির মত। যে ব্যক্তি উহাতে আরোহন করবে- সে নাজাত পাবে এবং যে বিরত থাকবে, সে ডুবে মরবে”। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে “ধংস হবে”। (অর্থাৎ তোমরা আমার আহলে বাইতের পথ ধরো)। “আমার আহলে বাইতের আর একটি উদাহরণ হচ্ছে- বনী ইসরাইলের হিত্তা প্রাচীরের ন্যায়- যারা উক্ত প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, তারা ক্ষমা পেয়েছে।” (তোমরা ও আমার আহলে বাইতের আশ্রয়ে থাকলে ওগাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে)।

৬। ইমাম দায়লামী রেওয়ায়াত করেছেনঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ حَتَّى يَخْلُقَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ-

অর্থ : “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- দোয়া সমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে- যে পর্যন্ত না মোস্তাদরাক (দঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করা হয়”। (দায়লামী)

৭। ইমাম শাফেরী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি কবিতায় আহ্লে বাইতের প্রতি মহব্বৎ পোষন ও তাঁদের উপর দরুদ পাঠ করার ফজিলত এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمْ + فَرَضَ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ -
كِفَاكُم مِّنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنْكُمْ + مَنْ لَمْ يَصِلْ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ -

অর্থঃ “হে নবীজীর বংশধরগণ। আপনাদের প্রতি মহব্বৎ ও ভালবাসা পোষন করাকে আল্লাহ্ তায়ালা ফরজ বলে ঘোষণা করে কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। আপনাদের মহান মর্যাদার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে- যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতি দরুদ পড়বেনা- তার নামাযই হবেনা।”

অনেক মুহাক্কিক আলেম বলেন- যারা গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করবে-তারা আহ্লে বাইতকে নিজেদের নিরাপত্তা হিসাবেই দেখতে পাবে। তাঁরা শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের কার্যক্রমের উপর স্থির প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা মুত্তাকী ও পরহেজগার। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের অনুসারী। তাঁরা জুলুমকে বরদাস্ত করেন না। তাঁদের আলেমগণ হেদায়াত গগনের সূর্য্য। সুতরাং তাঁরা উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁদের মধ্যে একটি দল প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান থাকেন- যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেন। এজন্যই নবী করিম (দঃ) বলেছেন-“তাঁদেরকে আঁকড়িয়ে ধরো। তাহলে পথভ্রষ্ট হবেনা।” যারা তাঁদের সাথে শক্রতা রাখে-তারা মুনাফিক। -লেখক

মোট কথা- আহ্লে বাইতের সাইয়েদগণ বা হযরত ফাতেমার বংশধরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও হেদায়াতের কাজে লিপ্ত আছেন। উনিরাই উম্মতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের বরকতেই উম্মতের বালা মুসিবত দূর হচ্ছে। তাই- নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে উম্মতের এবং জমিন বাসীর জন্য নিরাপত্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করলে কেউ গোমরাহ হবেনা। - ইনশাআল্লাহ্। -অনুবাদক

বিংশ অধ্যায়

আহ্লে বাইতের নাজাতের ব্যাপারে বিরোধীদের ভুল ব্যাখ্যা খণ্ডন

প্রশ্নঃ আচ্ছা! সহীহ হাদীসে দেখা যায় যে- নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

قَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بِنِي
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ انْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا.

অর্থ : “হে মুহাম্মদ (দঃ)-এর কন্যা ফাতেমা, হে সফিয়া বিন্তে আবদুল মোত্তালিব, হে বনী আবদুল মোত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করো। কেননা, আমি তোমাদের উপকারার্থে আল্লাহুর পক্ষ হতে কোন কিছু মালিক নই।” উক্ত হাদীসে বুঝা যায় যে- নবী করিম (দঃ) তাঁদের জন্য কোন উপকার করতে পারবেননা। এ হাদীসের জবাব কি এবং হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যাই বা কি?

উত্তর : হাদীসে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে- তন্মধ্যে বিবি ফাতেমা (রাঃ) বেহেস্তের নারীদের সর্দার। বিবি সফিয়া (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর আপন ফুফু ও মুসল-মান মুহাজির সাহাবীয়া- যিনি বিনা হিসাবে জান্নাতী। আবদুল মোত্তালিব বংশের অন্যান্য যারা মুসলমান হয়েছেন- তাঁদেরকে উপলক্ষ্য করেই নবী করিম (দঃ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে বুঝা গেলো যে, মূলতঃ হাদীস খানা তাঁদের উদ্দেশ্যে নয়-বরং একটি মূলনীতি বর্ণনা করাই এর মূল লক্ষ্য। তা হচ্ছে-“নিজস্ব মূল পুঞ্জি না থাকলে অর্থাৎ ঈমান না থাকলে- নবী করিম (দঃ) কাউকে রক্ষা করতে পারবেন না। এমনকি নিজের বংশ হলেও নয়।” ঈমান থাকলে শত গুনাহ্গার হলেও নবী করিম (দঃ) শাফাআত করবেন বলে অন্য হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। সাধারণ মুসলমানকে যখন শাফাআত

করে কেয়ামতের দিনে তিনি রক্ষা করবেন, তখন নিজ বংশ এবং বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত
নিজের আত্মীয়গণকে রক্ষা করতে পারবেন না- এটা কোন মতেই হতে পারেনা। বর্ণিত
হাদীস খানা অন্যান্য সমস্ত হাদীসের বাহ্যিক পরিপন্থী বিধায় এই হাদীস খানাকে বিভিন্ন
ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হাদীসের যাচাই-বাছাই পদ্ধতি। তাহলে হাদীস
খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগন যা
বলেছেন-তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। প্রথম ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদীস খানা ইসলামের প্রথম যুগে মক্কা শরীফে বর্ণিত- যখন
পর্যন্ত শাফাআতের আয়াত নাযিল হয়নি। নবী করিম (দঃ) যে পরকালে কাউকে
শাফাআত করে রক্ষা করতে পারবেন- সে বিষয়ে তাঁকে তখনও অবহিত করা হয়নি।
মোট কথা- হাদীস খানা পরবর্তীতে মানসুখ হয়ে যায়। মদিনা শরীফে পরবর্তীতে
শাফাআত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা মক্কা শরীফে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস খানার হুকুম
রদ হয়ে যায়। সুতরাং মানসুখ হাদীস দ্বারা কোন দলীল পেশ করা বৈধ নয়। আশ্চর্যের
কথা, বিরোধীরা জেনে শুনেই মানসুখ হাদীস ব্যবহার করে নবীজীর প্রকৃত শানকে গোপন
করে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। নবীজীর প্রকৃত শান গোপনকারীগণ অবশ্যই কাফের বলে
গন্য।

২। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : যদি হাদীস খানাকে বহাল বলেও ক্ষনিকের জন্য স্বীকার করে নেয়া
হয়, তাহলে হাদীসের এই অংশটুকু অবশ্যই ব্যাখ্যা
সাপেক্ষ বিষয়। এই অংশে বলা হয়েছে- “নবী করিম (দঃ) মানুষের উপকারের ক্ষেত্রে
আল্লাহর পক্ষ হতে কিছুই মালিক নন”। অথচ অন্যান্য হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,
তিনি পরকালে শাফাআতের মালিক এবং সুপারিশ করে গুণাহগারকেও রক্ষা করার
অধিকারী। তিনি হাউজে কাউছারেরও মালিক। দোজখ হতে রেয়ায়েতী মেয়াদে
দোজখবাসীকে বের করে আনার অনুমতি প্রাপ্ত- ইত্যাদি। যাবতীয় মঙ্গলের মালিকানা
তাঁকে আল্লাহ দান করেছেন। সূরা ইন্না আতাইনাকাল্ কাউছার-ছুরাটিই-এর প্রমাণ।
“আতাইনা” শব্দ এবং “কাউছার” শব্দ দুটি অতি ব্যাপক। আরবী إعطاء শব্দটির অর্থ
হলো- চির সত্ত্ব দান করা এবং কাউছার অর্থ- খায়রে কাছির অর্থাৎ যাবতীয় মঙ্গল। অর্থাৎ
এই সুরায় নবীজীকে যাবতীয় মঙ্গলের চির সত্ত্ব দান করা হয়েছে। মদিনা শরীফে আসার
পর এই সুসংবাদবাহী সূরা কাউছার নাজিল হয়েছে। এখন হাদীস খানার প্রকৃত ব্যাখ্যা
তাফসীরে রহুল বয়ান সহ বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নরূপেঃ

قَالَ الْعُلَمَاءُ لَا تَعَارِضُ بَيْنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ
الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مَعْنَى
الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَا
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْلِكُهُ نَفْعَ أَقَارِبِهِ بَلْ جَمِيعِ أُمَّتِهِ
بِالْشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ فَهُوَ لَا يَمْلِكُ بِنَفْسِهِ إِلَّا مَا يَمْلِكُهُ لَهُ
مَوْلَاهُ عَزَّوَجَلَّ وَكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةٍ
لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَيْ بِمَجَرَّدِ نَفْسِي مِنْ غَيْرِ مَا يَكْرِهُنِي
اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفَاعَةٍ أَوْ مَغْفِرَةٍ مِّنْ أَجَلِي وَنَحْوِ ذَلِكَ-

অর্থঃ “হাদীসও তাফসীর বিশারদ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন : এই হাদীস এবং নবীজীর
বংশধরগণের ফজিলত সম্পর্কিত অন্য হাদীস সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা,
বর্তমান হাদীস খানার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে “নবী করিম (দঃ) নিজে নিজে কারও উপকার বা
অপকার করার মালিক নন; বরং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তাঁর আত্মীয় স্বজন সহ সকল
উম্মতের উপকার করার মালিক বানিয়েছেন। এই উপকার করার মালিকানা তিনি পেয়েছেন
সাধারণ ও বিশেষ শাফাআত করার ক্ষেত্রে। সুতরাং তিনি নিজে নিজে মালিক নন; বরং
তাঁর মাওলা আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে মালিক বানিয়েছেন। তিনি বর্তমান হাদীসে স্বয়ং সম্পূর্ণ
ও মৌলিক মালিকানারই অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছেন। দানকৃত মালিকানার অস্বীকৃতি তো
এই হাদীসে নেই। (“মালাকা ইয়ামলিকু” অর্থ-নিজে নিজে মালিক হওয়া এবং “মাল্লাকা
ইউ মাল্লিকু” অর্থ- অন্যের দ্বারা মালিক হওয়া) নবী করিম (দঃ) প্রথমটির অস্বীকৃতি
জানিয়েছেন- দ্বিতীয়টির নয়। ইহাই সঠিক ব্যাখ্যা।

অনুরূপ ভাবে অন্য রেওয়াজাতে বর্ণিত “আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের কোন কাজে আসবোনা” এই হাদীস খানার মর্মও এই যে- আমি নিজে নিজে তোমাদের কাজে আসবোনা। কিন্তু আমার রব আমাকে শাফাআত ও মাগফিরাতের ক্ষমতা দান করে সম্মানিত করেছেন। এই পর্যায়েই আমি উপকার করার অধিকার লাভ করেছি। আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস নিজ নিজ স্থানে বহাল। ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

৩। তৃতীয় ব্যাখ্যাঃ “লা আমলিকু” হাদীস খানার উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্ক করা, ভয়ভীতিতে রাখা এবং খোদার রহমতের প্রত্যাশী করে রাখা- যাতে কেউ ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে উদাসীন না হয়ে যায়। এরূপ হাদীসকে মোহাদ্দেসীনে কেরাম “তাহযীর ও তাহদীদ” বা ভয়ভীতি প্রদর্শন মূলক হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

একদল লোক আছে- যারা খুঁজে খুঁজে নবীজীর অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ফেক্রা বের করে। তারা অন্যান্য দিক বিবেচনা না করে এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ না দেখেই সোজাসোজি হাদীস ও কোরআনের শুধু অর্থ বলে মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এরা প্রকৃত পক্ষেই নবীজীর দূশ্মন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব লোকের সংশ্রব থেকে রক্ষা করুন। - অনুবাদক।

এক বিংশ অধ্যায়

নবী করিম (দঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার উপকারিতা প্রসঙ্গে

(نَفْعُ الْإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

প্রশ্নঃ নবী করিম (দঃ)- এর সাথে বংশীয় বা বৈবাহিক সম্পর্কের কোন উপকারিতা আছে কি!

উত্তরঃ হাঁ, অবশ্যই উপকারিতা আছে। অনেক সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে- হুজুর আকরাম (দঃ)-এর সাথে বংশীয় সম্পর্ক দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জাহানেই উপকারী। এ প্রসঙ্গে একখানা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

ইবনে আসাকির সংকলিত হযরত ওমর (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হাদীস :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَسَبٍ وَصْهَرٍ يَنْقُطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِي وَصْهَرِي (رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِر)

অর্থঃ “হযরত ওমর উবনুল খাতাব (রাঃ) বর্ণনা করেন - নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিনে প্রত্যেকের বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে - অর্থাৎ এই সম্পর্ক কোন উপকারে আসবেনা। কিন্তু আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা- অর্থাৎ তাঁদের উপকারে আসবে”। ইবনে আসাকির।

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস প্রমাণ বহন করে যে- নবী করিম (দঃ)-এর সাথে বংশগত সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক খুবই উপকারী। প্রশ্ন হতে পারে -কোন কোন হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করিম (দঃ) আপন আহলে বাইতকে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের জন্য তাকিদ ও সতর্ক করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে - “আমি

তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ক্ষমতার মালিক নই” (আল হাদীস। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- নবী করিম (দঃ) নিজ ক্ষমতার বলে কারও উপকার অথবা অপকারের মালিক নন। তবে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে আপন আত্মীয় স্বজনদের ও উম্মতের উপকারের মালিক বানিয়েছেন। সুতরাং যে হাদীসে তিনি উপকারের মালিক নন বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো- নিজ ক্ষমতাবলে আল্লাহ প্রদত্ত শাফাআত ও মাগফিরাতের মর্যাদা ছাড়াই উপকারের মালিক নন। কাজেই - হুজুর আকরাম (দঃ) আপন আত্মীয় স্বজনকে কেবল এ ধরনের অননুমোদিত উপকার করার কথাই অস্বীকার করেছেন। অতএব উভয় হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

ইমাম তাবরানী ও ইমাম বাজ্জার একথানা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে নবী করিম (দঃ) উপকারের কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ
أَنْ قَرَأَ بَتِّي لَا تَنْفَعُ - إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْأَسْبَبِيُّ وَنَسَبِي وَإِنْ رَحِمِي مُؤْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

অর্থঃ “নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- ঐ সম্প্রদায় গুলোর (বাতিল পন্থীদের) কি হলো? তারা ধারণা করে- আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন উপকারে আসবেনা। শুনে রাখো- প্রত্যেক বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিনে ছিন্ন হয়ে যাবে-কিন্তু আমার বৈবাহিক সম্পর্ক ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হবেনা। আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই অটুট থাকবে”। (তাবরানী ও বাজ্জার)

ইমাম আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি নবী করিম (দঃ) কে মিস্রাবে দাড়ীয়ে একথা বলতে শুনেছিঃ

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تَنْفَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - بَلَى وَاللَّهِ أَنْ رَحِمِي مُؤْ-
- صُؤْلَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْتِ أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى
الْحَوْضِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ)

অর্থঃ “ নবী করিম (দঃ এরশাদ করেছেনঃ ঐ লোকগুলোর কি হলো- যারা বলে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পরকালে তার স্বজাতির কোন উপকার করতে পারবেনা। অবশ্যই পারবে। নিঃসন্দেহে আমার সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ দুনিয়া ও আখিরাতে অটুট থাকবে। আর-হে লোক সকল! আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউছারে গিয়ে পৌছবো”। (ইমাম আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরি খালক্বিহি, ওয়া আলিহী, ওয়া আস্হাবিহী ওয়া ইত্রাতিহী, ওয়া আহলি বাইতিহী, ওয়া আহলি মোহাব্বাতিহী আজমাদিন।

অনুবাদ সমাপ্ত : ২৯ রমজান- ১৪১৭ হিজরী, রোজ শনিবার।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

লেখকের নাম : হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আকিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী। পিতার নাম : মুসী আদম আলী মোল্লা। মাতার নাম : মালেকা খাতুন। জন্ম : ২৬শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

বংশ পরিচয় ও জন্ম স্থান : গ্রাম : আমিয়াপুর, পোঃ পাঠান বাজার, থানা : মতলব, জিলা চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুয়ুর্গ ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহ) ছিলেন লেখকের বংশের পূর্ব পুরুষ। হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহ) রচিত ফেকাহ নীতি শাস্ত্র নুরুল আনওয়ার গ্রন্থখানী দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্য কিতাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিয়ুন (রহ)-এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা ও বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বর্তমান বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবন : লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফজ আরম্ভ করেন এবং ১৯৫২ সালে দু'বছর তিন মাসে হিফজ শেষ করেন। তারপর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৬ ইং সালে দাখিল, ১৯৬০ ইং সালে আলিম, ১৯৬২ ইং সালে ফাজিল ও ১৯৬৪ ইং সালে কামিল (হাদীস) ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম এ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ পাস করেন। ১৯৭০ সালে জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও নওয়াব ফয়জুল্লাহ কলেজে ১৯৭৫ সইং সাল পর্যন্ত ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং হযরত তারেক শাহ (রহ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ ইং সালে ১ বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রভেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে উত্তফা দেন। ১৯৭৩ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে কয়েক মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে চাকুরী নিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ ইং পর্যন্ত মধ্যখানে ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে পুনরায় যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব, ওয়াজ নসিহত ও আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফসহ তার লিখিত ও সম্পাদিত ১১ খানা গ্রন্থ রয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ : ১৯৮০ সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের অতজমীর শরীফে হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ (রহ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত শাহ আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহ) এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ফয়েজ ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ ইং সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে যোগদান করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফে গাউসুল আযম (রহ)-এর মাযারসহ অসংখ্য ওলী ও নবীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ ইং ও ১৯৮৫ ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহবানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে ছুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে ১১তলা বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৭ ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের মোতাওয়াল্লী সাইয়্যেদ আবদুর রহমান আল-গিলানী সাহেব তাঁকে কাদেরিয়া তরিকার খেদমত করার জন্যে খেলাফত প্রদান করেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তারিখ : জুন, ১৯৯৮ ইং।